ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

এপ্রিল ২০২০ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

ভারতের সংবিধান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মানবাধিকার রক্ষায় সংবিধান
জয়দীপ গোবিন্দ

ফোকাস

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য
ড. রণবীর সিং
ড. ঋতু গুপ্তা

বিশেষ নিবন্ধ

ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা
এস. এন. ত্রিপাঠী
সি. শীলা রেড্ডি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন
ড. আর. এস. বাওয়া

ভারতের সংসদ : কাজের খতিয়ান ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ
এম. আর. মাধবন

হাতে লেখা সংবিধান

ভারতের সংবিধান। ছাপা নয়, টাইপ করাও নয়। হাতে লেখা। ইংরেজি ও হিন্দিতে ক্যালিগ্রাফি (শিল্পস্বরূপ হস্তলিপি) করেছেন দিল্লির প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা। আচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে গোটা জিনিসটা আকার পেয়েছে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের হাতে।

ভারতের সংসদ ভবনের গ্রন্থাগারে হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বিশেষ বাক্সে ভারতের সংবিধানের মূল নথি সংরক্ষিত। সংবিধানের এক একটি ভাগের শুরুতে ভারতের জাতীয় অভিজ্ঞতা তথা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের চিত্র তুলে ধরেছেন নন্দলাল বসু। মোট ২২-টি শিল্পকলা ও চিত্রের মধ্যে বেশিরভাগই মিনিয়েচার (আক্ষরিক অর্থে সূক্ষ্ম বা অতি ক্ষুদ্র) ঘরানার। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো, বৈদিক যুগ, গুপ্ত, মৌর্য ও মুঘল সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন—ভারতীয় মহাদেশের চার হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ফুটিয়ে তুলেছেন নন্দলাল বসু।

৩৯৫-টি অনুচ্ছেদ, ২২-টি ভাগ ও ১২-টি তপশিল—সব মিলিয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান এটি।❑

সূত্র www.doj.gov.in

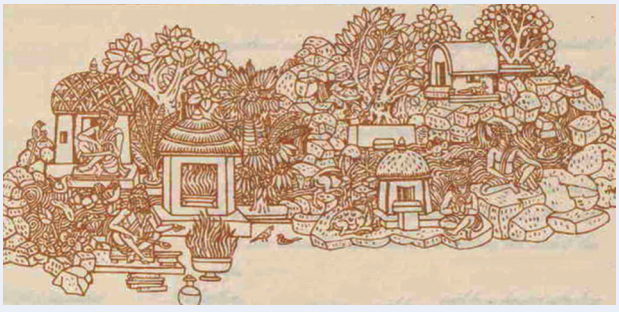

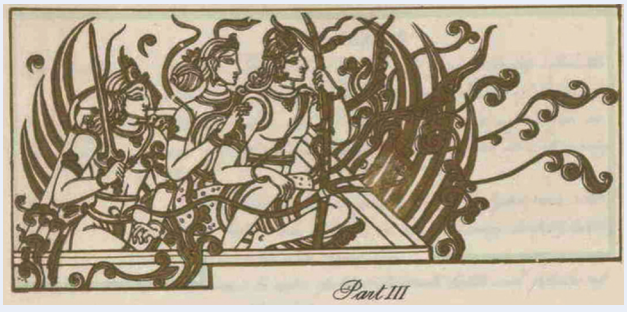

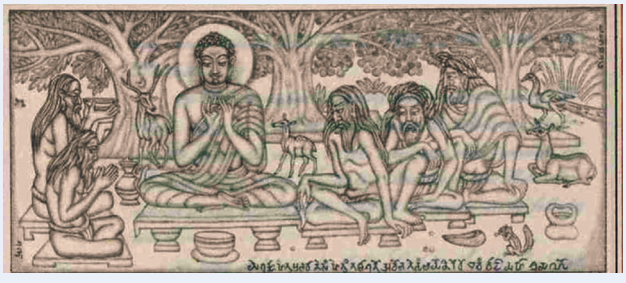

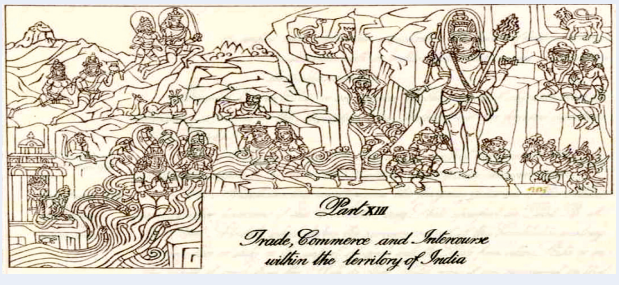

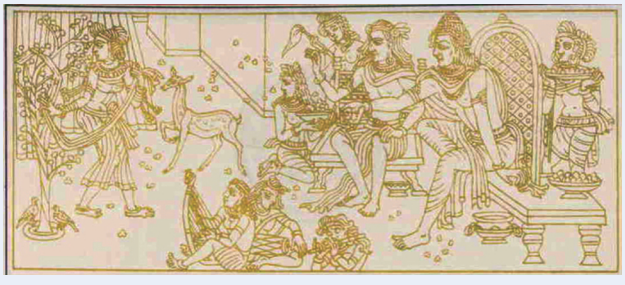

সংবিধানের মূল নথির কয়েকটি অলংকরণ

এপ্রিল, ২০২০

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র চৌধুরী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহকারী-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

এই সংখ্যায়

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
মানবাধিকার রক্ষায় সংবিধান
জয়দীপ গোবিন্দ ৫

ফোকাস
মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের
মধ্যে ভারসাম্য
ড. রণবীর সিং
ড. ঋতু গুপ্তা ১০

লক্ষ্য এবং রূপায়ণ
অনুভব কুমার ১৩

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের
সংবিধান প্রণয়ন
ড. আর. এস. বাওয়া ১৬

আদালতের রায় বনাম সংবিধান সংশোধন
এন. এল. রাজাহ ১৮

ভারতের সংসদ : কাজের খতিয়ান
ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ
এম. আর. মাধবন ২১

গণপরিষদ এবং সংবিধান রচনা ২৬

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা
ড. এম. আর. শ্রীনিবাস মূর্তি
সুরভি সিং ৩০

বিশেষ নিবন্ধ
ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও
যাচাইয়ের ব্যবস্থা
এস. এন. ত্রিপাঠী
সি. শীলা রেড্ডি ৩৩

বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ভারতীয় সংবিধান
মনোজ কুমার সিংহ ৩৮

নারীর অধিকার : অঙ্গীকার ও পদক্ষেপ
ড. কে. শ্যামলা ৪১

এক সজীব দলিল
মহিমা সিং ৪৫

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

নিয়মিত বিভাগ

যোজনা ক্যুইজ ৪৮
যোজনা নোটবুক ৪৯
জানেন কী? ৫১
যোজনা ডায়েরি ৫২
হাতে লেখা সংবিধান ..... দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
উন্নয়নের রূপরেখা ..... তৃতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আমরা, ভারতের জনগণ

সালটি ছিল ২০১৫। ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. ভীমরাও আম্বেডকরের ১২৫-তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ। ভারত সরকার ২৬ নভেম্বর দিনটিকে প্রত্যেক বছর 'সংবিধান দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৯ সাল সংবিধান গ্রহণের ৭০-তম বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সরকার ধারাবাহিক একগুচ্ছ উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংবিধানের মর্মার্থ উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছে। উদ্দেশ্য দু'টি। প্রথমত, ভারতের সংবিধান রচনার মুখ্য পরিকল্পককে পুনরায় জাতির তরফে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; এবং দ্বিতীয়ত, এদেশের গৌরবময় ও সমৃদ্ধ মিশ্র কৃষ্টি এবং আমাদের জাতির বৈচিত্র্যকে জনমানসে অকুণ্ঠভাবে বিজ্ঞাপিত করা। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল তারিখটি ছিল ড. আম্বেডকরের ১৩০-তম জন্মজয়ন্তী।

'যোজনা'-র বর্তমান সংখ্যাটি মহান এই মানুষটির উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের সংবিধানের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। দীর্ঘ সত্তর বছরেরও পূর্বে লিখিত এই নথি বর্তমান সময়েও সরকার, বিচার ব্যবস্থা এবং নাগরিকদের জন্যও সমভাবে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত। ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্য; এই তিন মূল নীতির প্রতি সংবিধানের অবিচল একনিষ্ঠতা ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে নাগরিকদের নিজ নিজ মৌলিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করায়। তথা সরকারের জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে আমাদের সংবিধান সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজের জন্য এক আলোক দিশারির ভূমিকা পালন করে।

নিরন্তর অক্লান্ত গবেষণা এবং পারদর্শী/বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত বিচারবিবেচনার ফসল ভারতের সংবিধান। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা তাদের দূরদৃষ্টি এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভবিষ্যৎ উপযোগী এবং বলিষ্ঠ এক নথি প্রস্তুত করেন। একদিকে তা আমাদের আদর্শ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, তা সমস্ত ভারতীয়ের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখে। আমাদের সংবিধান রচয়িতাগণ সেযাবৎকালীন বিদ্যমান সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্রের সেরা বৈশিষ্ট্যসমূহ বাছাই করে সংকলিত করেন। ফলত, তা হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ এবং বিশদ সাংবিধানিক নথি। ভবিষ্যতে সংশোধনের সংস্থান থাকাটা এই নথির এক বিশেষ সুবিধাজনক দিক। সংবিধান যাতে চূড়ান্ত অনমনীয় বা অতি নমনীয়, এর কোনওটাই না হয়, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। দীর্ঘ সাত দশক ধরে, একশোরও বেশি সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধান হয়ে উঠেছে প্রভূত বলিষ্ঠ তথা সাম্প্রতিক সময়কালে এমনকী আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

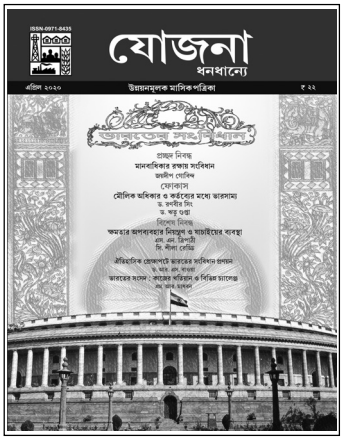

সংবিধানের প্রস্তাবনা ভারতকে এক সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছে। একই সাথে তা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সুনিশ্চিত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি দায়বদ্ধ কল্যামূলক রাষ্ট্র হিসাবেও ভারতকে ঘোষণা করেছে; যে রাষ্ট্র কিনা সৌভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটাবে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য একে অন্যের্য সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য সংবিধানের গণ্ডি মেনে চলা এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মান প্রদর্শন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শসমূহ অনুসরণ ও স্বযত্নে লালন; নারীর মর্যাদাহানিকর কার্যাবলী পরিত্যাগ; এবং আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও তার মূল্যবিধানও নাগরিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

যুগ যুগ ধরেই ভারতীয় সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের কেন্দ্রে স্থান পেয়ে এসেছে আইনের শাসন। ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার যে মূল্যবোধ ভারত চিরকাল লালন করে এসেছে তা আমাদের সংবিধানকে অনুপ্রাণিত করেছে। দেড় হাজারের মতো সেকেলে আইনকানুন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে প্রাসঙ্গিকতাহীন আইন বাতিল করেই ক্ষান্ত দেওয়া হয়নি; একই গতিতে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করা হয়েছে সামাজিক বুনট শক্তপোক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাদের সংবিধানের মুখ্য পরিকল্পক ড. বি. আর. আম্বেডকর বলেছেন, ''সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনি নথি নয়; তা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শকট, এর সারমর্মই সর্বদা সময়ের মর্মের সমার্থক''।

রূপান্তরকামীদের অধিকার প্রদান, তিন তালাক প্রথা রদ, প্রতিবন্ধী মানুষজনের অধিকারের গণ্ডি প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নকল্পে সরকার চূড়ান্ত সহমর্মিতার তথা সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করেছে, যা কিনা এক আধুনিক সমাজের অন্যতম চাহিদা।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তি হল ''ভারতের সংবিধান''। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সর্বোচ্চ নথি তা; যা কিনা নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের আগামী প্রচেষ্টায় পথপ্রদর্শন করে চলেছে।

যোজনা-র সাথে তার পাঠকদের নাড়ির টান। আশা করি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং সরকারি কর্মীবর্গ-সহ সমস্ত পাঠকের কাজে আসবে সংখ্যাটি।❑

মানবাধিকার রক্ষায় সংবিধান

জয়দীপ গোবিন্দ

"মানবাধিকার সরকারের দেওয়া কোনও সুযোগসুবিধা নয়। মানবতার শর্ত হিসেবে তা প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য অধিকার"
—মাদার টেরেজা

উন্নয়নের পথে চলতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অনেক বিপ্লবের সাক্ষী থেকেছে এই বিশ্ব। তবে একটা কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে মানবাধিকারকে স্বীকৃতি না দিলে উন্নয়নের সমস্ত বুলিই অর্থহীন। এখন প্রশ্ন হল, মানবাধিকার বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে শুধু মানুষ হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক মানুষের যে অধিকার রয়েছে তাই মানবাধিকার। এগুলি প্রত্যেক মানুষের জন্যই অপরিহার্য শর্ত বিশেষ, নচেৎ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা যায় না। মানবাধিকার হল মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা; যা আমাদের মানবিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলী তথা আমাদের প্রতিভা ও বিবেকের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটায় ও তার ব্যবহারে আমাদের সাহায্য করে এবং আমাদের শারীরিক, আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে।

মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলিকে মানবাধিকারের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠার আবেদন জানানো হয়েছে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দু'টি চুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলি একই সঙ্গে সাধারণ ও সর্বজনীন। এর মধ্যে একটিতে রয়েছে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারের কথা; আরেকটি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত। এই দু'টি চুক্তিতেই এমন সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে যেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ ভোগ করবে। ১৯৬৬ সালে গৃহীত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঐচ্ছিক প্রোটোকলে সাম্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, নিয়মবহির্ভূত ধড়পাকড় ও আটকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তিগত পরিষেবা দানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও বিবেকের স্বাধীনতা, দেশের প্রশাসনে অংশগ্রহণের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৯৬৬ সালের গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে কাজের অধিকার, ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার, যৌথ দরাদরির অধিকার, ব্যবসাবাণিজ্য বা জীবিকা গ্রহণের অধিকার, নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেহেতু অবিচ্ছেদ্য ও একে অপরের ওপর নির্ভরশীল তাই এই সমস্ত অধিকার প্রয়োগ, তার প্রসার ও রক্ষায় সমান গুরুত্ব দিতে হবে। মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে নিজেদের আইনকানুনের সঙ্গতি রাখতে বহু দেশই আইন প্রণয়ন করেছে। ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র। আন্তর্জাতিক এই চুক্তিগুলি কার্যকর হওয়ার অনেক আগেই নাগরিকদের বেশকিছু অধিকার দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান; যেগুলির উল্লেখ রয়েছে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে। এই অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য, সম্মান, মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা। সেই সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা, যার অর্থ হল যেকোনও মানুষ নিজের মতামত ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ, ধর্মাচরণ ও ধর্ম প্রচার করতে পারে। রয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অধিকার রয়েছে সংখ্যালঘুদের। এই অধিকারগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য এবং প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপের মাধ্যমে এগুলি খর্ব করা যায় না।

[লেখক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব। ই-মেল : sgnhrc@nic.in]

মানবাধিকার

মৌলিক স্বাধীনতাগুলির স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সব মানুষের মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে সংবিধানে। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ছয়টি শ্রেণিতে এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত। এই অধিকারগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আদালতের বিভিন্ন রায়ে সংবিধানে প্রদত্ত এই মৌলিক অধিকারগুলির বিশেষ গুরুত্বের কথা উঠে এসেছে। কেশবানন্দ ভারতী, মিনার্ভা মিলস বা আই. আর. কোয়েলহো-র মতো সাড়া জাগানো মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধনের ঊর্ধ্বে না হলেও কিছু অধিকার বা তার অংশবিশেষ সংবিধানের মূল অংশ এবং সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় প্রদত্ত সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগ করেও সেগুলিকে সংশোধন করা যায় না।

মৌলিক অধিকারসমূহ

১. সাম্যের অধিকার। এর মধ্যে রয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য; ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা;

২. বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়া তথা সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, চলাফেরা করা ও বসবাসের স্বাধীনতা, যেকোনও বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা (রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, জনশৃঙ্খলা, শিষ্টতা বা নৈতিকতার স্বার্থে এর মধ্যে কয়েকটি অধিকার খর্ব করা যেতে পারে);

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। এখানে বলপূর্বক পরিশ্রম করানো, শিশুশ্রম ও মানব পাচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

৪. বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী যেকোনও ধর্ম গ্রহণ, ধর্মাচরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা;

৫. নাগরিকদের সমস্ত সম্প্রদায়কে নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা বা লিপি সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তার পরিচালনার জন্য সংখ্যালঘুদেরও অধিকার দেওয়া হয়েছে; এবং

৬. মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে অধিকারের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিচার বিভাগের বিভিন্ন রায় তথা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত পক্ষ এগুলিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে। জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার আমাদের একটা গর্বের জায়গা। এই অধিকারটিই সবচেয়ে মূল্যবান। বিচার বিভাগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে মানেকা গান্ধী মামলার রায়দানের আগে সংবিধানের ২১ ধারার ব্যাখ্যা অন্যভাবে হ'ত। শাসন বিভাগের যেসমস্ত পদক্ষেপের কোনও আইনি ভিত্তি নেই সেগুলির বিরুদ্ধে এক সুরক্ষাকবচ ছিল এই ধারা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মামলার পরে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এই মামলার রায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ওপরও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। রায়ে বলা হয়, কোনও ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া যখন শুরু হবে তখন এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে সেই প্রক্রিয়া যেন যুক্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত হয়। সুপ্রিম কোর্ট তার বিভিন্ন রায়ে একটা কথা বারবার বলেছে যে শুধুমাত্র জীবনধারণ বা প্রাণ বাঁচিয়ে রাখা নয়, ২১ নং ধারায় প্রদত্ত অধিকারের তাৎপর্য অনেক গভীর। সংবিধানের যে অংশে মৌলিক অধিকারগুলি মূল মানবাধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই অংশের গুরুত্ব সর্বাধিক। রাষ্ট্রের কোনও পদক্ষেপই যাতে এই মৌলিক অধিকারের অংশবিশেষকে বাতিল করতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্রের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে মানবাধিকারগুলি এখন মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটির কথা নিচে তুলে ধরা হল :

- বেগার শ্রম বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ না করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের অধিকার।
- বেগার শ্রমিকদের মুক্তি ও পুনর্বাসন পাওয়ার অধিকার।
- বেআইনি কাজ ছাড়া অন্য যেকোনও উপায়ে জীবিকা নির্বাহের অধিকার।
- সুস্থ পরিবেশ ও ভদ্রস্থ বাসস্থান পাওয়ার অধিকার।

● দোষী, নির্দোষ নির্বিশেষে সকলকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে তাদের জীবনরক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে রাষ্ট্রের ওপর। আহত ব্যক্তির জীবনরক্ষা হলে তারপর তাদের ওপর ফৌজদারি দণ্ডবিধি কার্যকর হবে।

● নিজেদের ব্যয় ক্ষমতা অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির উপযুক্ত জীবন বিমা পাওয়ার অধিকার।

● সুস্বাস্থ্যের অধিকার।

● খাদ্যের অধিকার।

● জল পাওয়ার অধিকার।

● শিক্ষার অধিকার।

● যেকোনও বন্দি জেলের নিয়মবিধি সাপেক্ষে জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণের অধিকার পাবেন, যার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত পুষ্টি, বস্ত্র, মাথার ওপর ছাদ, লেখাপড়ার সুযোগ, বাড়ির সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদি।

● খ্যাতির অধিকার।

● মহিলাদের সম্মান ও শিষ্টাচার পাওয়ার অধিকার।

● দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার।

● হাতকড়া পরানোর বিরুদ্ধে অধিকার।

● হেফাজতে থাকাকালীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধিকার।

● গোপনীয়তার অধিকার।

● অপুষ্টির বিরুদ্ধে অধিকার।

● তথ্যের অধিকার।

রঞ্জিত সিং ব্রহ্মাজিৎ সিং বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে যে লিঙ্গ বৈষম্য, দূষণ, পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি, অপুষ্টি, বিভিন্নভাবে দলিতদের ওপর অত্যাচার...এ সবই মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। নিজের নির্দোষিতার কথা জানানোও একটা মানবাধিকার।

ব্যক্তি মানুষের অধিকারকে এভাবে সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয় রাখতে বিচার বিভাগ যে সক্রিয়তা দেখিয়েছে তা মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিককে সম্মান জানানো ও সেগুলিকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। এছাড়া, সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ রয়েছে তা দেশ শাসনের পক্ষে অপরিহার্য। এখন রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এই নীতিগুলিকে আইনের রূপ দেওয়া। বিচারবিভাগ মনে করে যে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের পরিপূরক। এগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা ঠিক হবে না। কারণ এগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

সাম্প্রতিককালে বিপন্ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেমন, LGBTI (সমকামী, রূপান্তরকামী ইত্যাদি) ইত্যাদিদের অধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট যুগান্তকারী সব রায় দিয়েছে। ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রায় দিয়েছে রূপান্তরকামীদের 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ভারতের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলি রয়েছে তা এই ধরনের ব্যক্তিদের ওপরও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্রীয়

সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে যে রূপান্তরকামীদের সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই রায়ের ফলে দেশে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগোনো যাবে।

নভতেজ সিং জোহর বনাম ভারত সরকার মামলায় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক ও সর্বসম্মত রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ে সমকামিতাকে অপরাধের তালিকা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, মানুষের যৌন প্রবণতা তার স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, গোপনীয়তা ও সাম্যের অধিকারের অন্তর্গত। সমলিঙ্গের দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্ক গড়ে তুললে রাষ্ট্র সেখানে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে সরকার প্রণয়ন করেছে মানবাধিকার রক্ষা আইন। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৪৪-তম বছরে প্রণীত এই আইনে মানবাধিকার রক্ষা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানান ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) ও রাজ্যগুলিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের সংস্থান রয়েছে। ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে মানবাধিকার রক্ষা ও তার প্রসারে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে প্যারিস নীতি গৃহীত হয়েছিল তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর ৪৮/১৩৪ বিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাও এই নীতিতে সিলমোহর দিয়েছে। মানবাধিকার রক্ষা ও তার প্রসারে ভারত সরকারের দায়বদ্ধতার প্রতীক হল এই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই কমিশনের কয়েকটি প্রধান কাজ হল :

কমিশন স্ব-উদ্যোগে বা অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধির আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলির তদন্ত করতে পারে।

(১) মানবাধিকার লঙ্ঘন বা তাতে সহায়তা;

(২) এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধে কোনও সরকারি কর্মীর গাফিলতিতে আদালতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংক্রান্ত কোনও মামলা পড়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি নিয়ে সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করা;

(৩) জেল বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে; যেখানে কোনও ব্যক্তিকে কয়েক করে রাখা হয় বা চিকিৎসা, সংশোধন বা সুরক্ষার জন্য বন্দি করা হয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে জানিয়ে সেই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করতে পারে কমিশন;

(৪) মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধান বা উক্ত সময়ে কার্যকর বিভিন্ন আইনে যে সুরক্ষাকবচগুলি রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে পারে এবং সেগুলি প্রয়োগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করতে পারে।

(৫) সন্ত্রাস দমন আইন-সহ যে বিষয়গুলি মানবাধিকার ভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখা ও প্রতিবিধানমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থার সুপারিশ করা;

(৬) মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি ও ঘোষণাপত্র খতিয়ে দেখা এবং সেগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে উপযুক্ত সুপারিশ করা;

(৭) মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা হাতে নেওয়া ও তার প্রসার;

(৮) সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানবাধিকার সংক্রান্ত সচেতনতার প্রসার; বইপত্র, সংবাদপত্র, আলোচনা সভা এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যে সুরক্ষাকবচগুলি রয়েছে সেবিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করা;

(৯) মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে চলেছে তাদের উৎসাহ দেওয়া;

(১০ মানবাধিকার রক্ষার আরও যেসমস্ত পদক্ষেপ প্রয়োজন সেগুলি নেওয়া।

বিগত ২৬ বছর ধরে দেশের দরিদ্র, সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ও অনগ্রসর শ্রেণি-সহ সমস্ত মানুষের মানবাধিকার রক্ষা ও তার প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই কমিশনের অন্যতম কাজ হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চালানো। ১৯৯৩ সালে জন্মলগ্ন থেকে এপর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১৮,৯৫,১৫৩-টি ঘটনা নথিভুক্ত

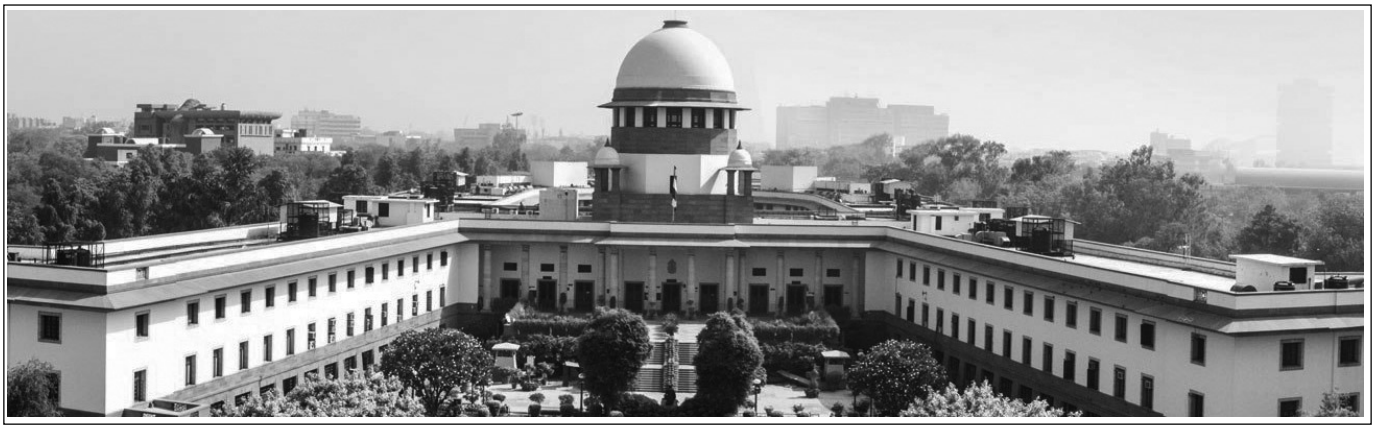

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এর ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ফলে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে নানান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। ভারতের যেসমস্ত ক্ষেত্রে মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে সেগুলি হল :

- উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের ব্যর্থতা
- বেআইনি আটক
- মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো
- হেফাজতে অত্যাচার
- বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার
- হেফাজতে মৃত্যু
- এনকাউন্টারে মৃত্যু
- বন্দিদের হয়রানি; জেলের পরিবেশ
- তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের ওপর অত্যাচার
- বেগার শ্রম ও শিশুশ্রম
- বাল্যবিবাহ
- সাম্প্রদায়িক হিংসা
- পণের জন্য হত্যা ও পণের দাবি
- মহিলাদের যৌন হয়রানি ও তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন
- মহিলাদের শোষণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য
- এইচআইভি/এইডস রুগিদের প্রতি বৈষম্য
- যৌনকর্মীদের প্রতি বৈষম্য

করেছে কমিশন এবং তার মধ্যে ১৮,৭৪,০০২-টি ঘটনার নিষ্পত্তি হয়েছে। দেশজুড়ে ৬,৮১৫-টি ঘটনায় মোট ১৮১,২০,০০,০২৬ (একশো একাশি কোটি কুড়ি লক্ষ ছাব্বিশ টাকা) টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিশন। ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই কমিশনের সুপারিশগুলি মেনে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য।

মানবাধিকার সংক্রান্ত আরও অন্যান্য দিক; যেমন প্রবীণ ব্যক্তি, মহিলা, শিশু ও রূপান্তরকামীদের অধিকার তথা বেগার শ্রম প্রথার অবসান, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সিলিকোসিস ইত্যাদির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে NHRC; গবেষণা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে অকুস্থলে অনুসন্ধান, কর্মশিবির, আলোচনাসভা, বিশেষ গোষ্ঠী গঠন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি ইত্যাদির মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে থাকে কমিশন। হেফাজতে মৃত্যু ও ধর্ষণ, পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। এসমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দোষী সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থারও সুপারিশ করেছে কমিশন।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে কমিশন। এর অঙ্গ হিসাবে HRCNet পোর্টালে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পোর্টালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই অভিযোগ যাতে দু'বার না দায়ের হয় সেজন্য রাজ্য মানবাধিকার কমিশনগুলিকেও শামিল করা হয়েছে। রিপোর্ট জমা পড়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে রাজ্যগুলির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগ দায়েরের জন্য চালু করা হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র। ওয়েবসাইটির পুরো খোলনলচে বদল করা হয়েছে; সেখানে অভিযোগগুলি কী অবস্থায় রয়েছে বা সেগুলির ভিত্তিতে দেওয়া নির্দেশগুলি নিয়মিত আপলোড করা হবে। সেইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট MADAD কাউন্টার খোলা হয়েছে; যেখানে কোনও অভিযোগ দায়েরের জন্য অভিযোগকারীদের সাহায্য করা হবে। মানবাধিকার রক্ষাকারী বা হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে কমিশনের। রাজ্যের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এই মানবাধিকার রক্ষাকারীরা বিপন্ন বোধ করলে তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে কমিশন।

সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ও সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে, যার ভিত্তিতে কমিশন পদক্ষেপ নেয় ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করে থাকে।

জেল, জেলের বন্দি ও বৃদ্ধাশ্রমগুলির অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে কমিশন। কমিশন নিজে অথবা তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলের পরিবেশ খতিয়ে দেখে এবং তা সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে দেশের আমনাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা ও তার প্রসারে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করাটা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তির প্রধান কর্তব্য।

পরিশেষে

সংবিধানে যে নীতিগুলির কথা রয়েছে, সেগুলি পালনে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় ভারত যে অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি সামাজিক কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করেছে যেখানে প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে। কিছু কিছু সমস্যা অবশ্য রয়েছে। কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সেগুলি অতিক্রম করা যাবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমরা আমাদের কর্তব্যগুলি পালন করলে তবেই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি দিয়ে আমি শেষ করছি-

''আমি আমার অশিক্ষিত কিন্তু অভিজ্ঞ মায়ের কাছ থেকে একটা কথা শিখেছি যে নিজেদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করলে তবেই অধিকার পাওয়া যায়। বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আমরা যখন নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারব তখনই আমরা বাঁচার অধিকার পাব। এই একটি বাক্যই নারী-পুরুষের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট এবং প্রতিটি অধিকার পেতে গেলে আগে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। অন্যসব অধিকারকেই না হলে জবরদখল বলে মনে হবে, যার জন্য মোটেই লড়াই করা যায় না।''❑

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য

ড. রণবীর সিং
ড. ঋতু গুপ্তা

চলতি বছরে সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭০ বছর পূর্তি হচ্ছে। এই ক্ষণটি উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে সরকার এগারোটি মৌলিক কর্তব্যের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের সঙ্গে মৌলিক অধিকার নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। এটি আমাদের নাগরিকদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মৌলিক কর্তব্যগুলি রয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। অর্থাৎ, সংবিধানে যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করতে গেলে আমাদের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেই হবে।

বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধানে ভারতের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোটি বিধৃত রয়েছে। ভারতের প্রতিটি নাগরিক যাতে ন্যায় ও সুবিচার পান তা সুনিশ্চিত করতে সংবিধান নির্মাতারা কিছু অপরিহার্য নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এই সংবিধান রচনা করেছেন। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংযোজন তারই ফসল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যেও এই অত্যাবশ্যক অধিকারগুলি যাতে অলঙ্ঘনীয় থাকে, তা নিশ্চিত করাই তাদের উদ্দেশ ছিল। ''অধিকার সংক্রান্ত বিল বলতে বোঝায় সেইসব অধিকার, যা মানুষ যেকোনও সরকারের জমানাতেই প্রয়োগ করতে পারেন এবং কোনও সরকারই একে অস্বীকার করতে পারে না।''

তবে এই স্বাধীনতা উপভোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযম দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। অবাধ স্বাধীনতা বলে কিছু হয় না। মৌলিক অধিকারের সঙ্গেই এসে পড়ে মৌলিক দায়িত্ব। সরকারের কাজকর্মের প্রতি নাগরিকদের বেড়ে চলা ঔদাসীন্যের দিকে নজর রেখে এই প্রবণতা ঠেকাতে ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাস হয়। এতে Part IV-A যুক্ত করে ৫১এ ধারায় মৌলিক কর্তব্যের বিষয়টি বলা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময় সময় সংবিধান সংশোধন করার যে প্রয়োজন রয়েছে, তা সবসময়েই স্বীকার করা হয়েছে।

চলতি বছরে সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭০ বছর পূর্তি হচ্ছে। এই ক্ষণটি উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে সরকার এগারোটি মৌলিক কর্তব্যের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। এগুলি যাতে প্রতিটি ভারতীয়ের ভাবনা ও কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, তার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। মৌলিক অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা সাংবিধানিক দিক থেকেও বিশেষ আবশ্যক, কারণ প্রতিটি অধিকারের সঙ্গেই সংলগ্ন থাকে কর্তব্য। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলতে গেলে-

''অধিকারের প্রকৃত উৎস হল কর্তব্য। আমরা সবাই যদি নিজেদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করি, তাহলে অধিকার আপনা-আপনিই পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্তব্য পালন না করে অধিকারের পিছনে ছুটলে তা আলেয়ার মতো মিলিয়ে যাবে। আমরা যত তার পিছনে ধাওয়া করবো, সে তত আরও দূরে সরে যাবে।''

''আমি আমার নিরক্ষর অথচ প্রাজ্ঞ মায়ের থেকে শিখেছি, কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করলে তবেই অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ করা যায়। বেঁচে থাকার অধিকার আমরা তখনই অর্জন করি, যখন বিশ্বনাগরিকের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে সমর্থ্য হই। এই বক্তব্য থেকেই সম্ভবত পুরুষ ও নারীর কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে এবং আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিটি অধিকারের নেপথ্যে রয়েছে এক একটা কর্তব্য, যা আগে পালন করতে হয়...।''

এই মৌলিক কর্তব্যগুলি আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রতিটি নাগরিকের উচিত ব্যক্তিগতভাবে এগুলি পালন করা। সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে, মৌলিক কর্তব্যগুলিও মৌলিক অধিকারের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ৫১এ ধারায় রাষ্ট্রের কোনও মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যই সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য। ৫১এ ধারা আসলে এক মাপকাঠির মতো, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজের মূল্যায়ন করা যায়। ভারত সরকার বনাম নবীন জিন্দল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে মৌলিক কর্তব্যের মধ্যেই

[শ্রী সিং জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। ই-মেল : vc@nludelhi.ac.in, ড. ঋতু গুপ্তা উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যাপক। ই-মেল : jha.anubhav87@gmail.com]

মৌলিক অধিকার প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং এই কর্তব্য পালন বহুক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

শ্যামনারায়ণ চৌকসে বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, সংবিধানের ৫১এ ধারা প্রতিটি নাগরিকের ওপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করে। তা হল জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মান করা। এই মামলার সূত্রেই শীর্ষ আদালত সিনেমা হলে ছায়াছবি প্রদর্শনের আগে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সংগীত বাজাবার নির্দেশ দেয়। এই সময়ে সবাইকে উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আসলে আদালত স্বদেশের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসার প্রকাশের একটি সর্বজনীন রূপ নির্দিষ্ট করতে চেয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দেখিয়ে ৫১এ ধারার অন্তর্নিহিত আদর্শের রূপায়ণ করতে চেয়েছে। আর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৫১এ(ডি) ধারা অনুসারে বলেছে, আইন বিভাগের কোনও কাজ যদি অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয়দান ও নিরাপত্তা প্রদানে সহায়ক বলে মনে হয়, সেক্ষেত্রে যেকোনও নাগরিক এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

কৌতূহলের বিষয় হল, ২০০২ সালে মৌলিক কর্তব্য হিসাবে ৫১এ(কে) ধারা এবং মৌলিক অধিকার হিসাবে ২১এ ধারা সংযোজিত হয়। এই দু'টি ধারার মাধ্যমে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে.

রাষ্ট্রকে শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আবার একইসঙ্গে যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না, তাদের শাস্তি দেওয়ার কোনও সংস্থান ৫১এ(কে) ধারায় নেই। একইভাবে ৫১এ(সি) ধারায় কিছু নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে নাগরিকদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অধিকার দেওয়া হয়েছে.

শীর্ষ আদালত অসংখ্য ক্ষেত্রে ৫১এ ধারায় ব্যাখ্যা করে তার রূপায়ণ করেছে। অবলবৎযোগ্য নানা কর্তব্য বলবৎযোগ্য হয়েছে বিভিন্ন মামলার রায়ে। কোনও স্বাধীনতার ওপর আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, কিছু ক্ষেত্রে আদালত তার বিচার করেছে মৌলিক কর্তব্যের সাপেক্ষে।

আদালত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকায় অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সাংবিধানিক যৌক্তিকতার সঙ্গে আইনের অন্যান্য শাখার যৌক্তিকতার তুলনা চলে না। এক্ষেত্রে আনুপাতিকতার নীতি এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত স্তর অনুসরণ করা হয়। কোনও সিদ্ধান্ত খুব অযৌক্তিক হলে তখনই একমাত্র আদালত হস্তক্ষেপ করে।

এখানে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সংবিধানের প্রশংসনীয় নীতিসমূহ এবং স্বাধীনতার পর সুনিপুণভাবে তৈরি আইনগুলি এখনও দেশের মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। এর একটা কারণ হয়তো এইসব নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। সেইজন্য নাগরিকদের কর্তব্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে তোলার উপযোগী এক পরিবেশ সৃষ্টি করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সকলেরই মনে রাখা উচিত, অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই তৃণমূল স্তরে সততার সঙ্গে কাজ করা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় অধিকার ও কর্তব্য, দুইয়ের প্রতিই সমান মনযোগী হওয়া উচিত। মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন সনদে বলা হয়েছে-''প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে, যা পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সার্বিক বিকাশ সম্ভব।"

আমাদের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের সঙ্গে মৌলিক অধিকার নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। এটা আমাদের নাগরিকদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মৌলিক কর্তব্যগুলি রয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। অর্থাৎ সংবিধানে যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করতে গেলে আমাদের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেই হবে।

মৌলিক কর্তব্যগুলি কীভাবে আরও কার্যকর করে তোলা যায়, ১৯৯৯ সালে বিচারপতি ভার্মা কমিটি সেবিষয়ে সুপারিশ করেছে। সংবিধানের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে কুড়ি বছর আগে জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশন বিচারপতি ভার্মা কমিটির সুপারিশগুলিও বিচার করে দেখেছে। কমিশনের কাছে সেদিন যে প্রশ্ন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আজও তাই আছে। আর তা হল :

সংবিধানের ৫১এ ধারা কি তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছে? যদি না পেরে থাকে, তাহলে যারা এই সংস্থান প্রণয়ন করেছিলেন, তারা তাদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালনে কোথায় ব্যর্থ হয়েছিলেন? সহ নাগরিকরাও বা ব্যর্থ হলেন কেন?

যদি জীবনের শুরুতে মানসিকতা গঠনের সময় থেকে মৌলিক অধিকার ভোগের

সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক কর্তব্য পালনের কথাটি সবার মনে গেঁথে দেওয়া যায়, তা হলে পরিবেশজনিত সঙ্কট, গণহিংসা, সন্ত্রাসবাদের মতো অনেক বড়ো বড়ো সমস্যার হাত থেকে আমরা অনেকটা রেহাই পেতে পারি।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য বিধান একান্ত আবশ্যক। একটির সঙ্গে আরেকটি না থাকলে দু'টির অর্থ ও অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এই দুইয়ের মধ্যেকার চমৎকার সম্পর্ককে লিপম্যান ভারি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"প্রতিটি অধিকার, যা আপনি ভোগ করেন, তার সঙ্গে রয়েছে কোনও না কোনও কর্তব্যপালনের অলিখিত অঙ্গীকার। আপনার প্রতিটি আশার পিছনে রয়েছে, কোনও না কোনও কাজের নেপথ্যকাহিনী, যা আপনাকে করতেই হবে। যেসব ভালো ঘটনা ঘটুক বলে আপনি চান... তার জন্য আপনাকে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম বিসর্জন দিতে হয়। কিছু না দিয়ে কিছু পাবার দিন আর নেই।"❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) *Siddharam Salingappa Mhetre v State of Maharashtra, AIR 2011 SC 312*

(২) Thomas Jefferson to James Madison, The Bill of Rights: A Brief History; Available at https://www.aclu.org/other/bill-rights-brief-history

(৩) http://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/chapter1.pdf

(৪) Jain, M.P; Indian Constitutional Law, Eighth Edition, Lexis Nexis, 2019 at 1502.

(৫) Mahatma Gandhi in a letter to Julien Huxley in 1947; Available at: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/all-rights-come-from-duty-well-done/

(৬) *AIIMS Students' Union v AIIMS, (2002) 1 SCC 510*

(৭) *AIR 2004 SC 1559*

(৮) *(2017)1 SCC 421*

(৯) Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983

(১০) *Ashoka Kumar Thakur v UOI,* (2008) 6 SCC 1

(১১) In Re: Ramlila Maidan Incident, 2012 (2) SCALE 682

(১২) *Fundamental rights and Duties go together;* Vice-President Sh. Venkaiah Naidu Addresses the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha in parliament on the occasion of Constitution Day on 26.11.2019; Available at https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=195002

(১৩) Article 29(1), Universal Declaration of Human Rights

(১৪) *Duty is right and rights are left:* Available at: https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19760715-swaran-singh-committee-recommends-new-chapter-on-fundamental-duties-in-the-constitution-819235-2015-04-09

(১৫) http://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/%28V%29Effectuation%20of%20Fundamental%20Duties%20of%20Citizens.pdf

(১৬) Justice Verma Committee on operationalization of Fundamental Duties Report [1999]

(১৭) Supra, p. 8

(১৮) Walter Lippmann; cited in Jimmy Carter; Public Papers of the Presidents of the United States, Book- 1; 1978.

লক্ষ্য এবং রূপায়ণ

অনুভব কুমার

নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় ৪২-তম সংশোধনীর মাধ্যমে। তবে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত ধারণা সংবিধানে জায়গা করে নিয়েছে প্রথম থেকেই। ভালোভাবে পড়লেই তা বোঝা যায়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস এবং উপাসনার অধিকারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্নে সমতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। এরই সঙ্গে, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষায় দায়িত্ব বর্তায় নাগরিকদের ওপর, এমনটাও বলা হয়েছে সেখানে।

অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনও অধিকারের দাবিদার হওয়ার অর্থ হল অন্য কোনও পক্ষকে সেই অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় অনুযায়ী, দেশের নাগরিকদের নির্দিষ্ট কয়েকটি অধিকার প্রাপ্য। এক্ষেত্রে দায়বদ্ধ সরকার। অন্যদিকে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ক ধারা মোতাবেক নাগরিকদেরও কিছু মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা। মৌলিক কর্তব্যের বিষয়টি প্রথমে সংবিধানে ছিল না। শরণ সিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংশোধনীর মাধ্যমে তা অন্তর্ভুক্ত হয় সংবিধানে। ওই পদক্ষেপ মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বিক ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে বলা আছে, ‘‘সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কিছু কর্তব্য আছে এবং তা পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব।’’ ১৯৭৬-এ ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় নাগরিকদের পালনীয় ১০-টি মৌলিক কর্তব্য। একাদশতম কর্তব্যটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০০২ সালে ৮৬-তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশিকা সম্পর্কিত (Directive Principles of State Policy)। তৃতীয়, চতুর্থ এবং চতুর্থ(ক) অধ্যায়ের মধ্যে একটি অভিন্ন ধারণার ইঙ্গিত মেলে। প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে মৌলিক অধিকারসমূহ। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে প্রশাসনের মৌলিক নীতি সম্পর্কে। নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহের কথা বলা আছে তৃতীয়টিতে। কাজেই, রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের অধিকার হরণ করবে না, তেমনই নাগরিকরাও দেশ গঠন ও সমাজ কল্যাণে নিজেদের মৌলিক কর্তব্যগুলি পালন করবেন। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলির অন্তর্ভুক্তির পেছনে অবশ্যই একটি লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কার্যকরভাবে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি এখনও, একথা বলাই বাহুল্য। ২০০০ সালে বিচারপতি এম. এন. ভেঙ্কটচালাইয়ার নেতৃত্বে সংস্থানসমূহের প্রয়োগ সংক্রান্ত জাতীয় পর্যালোচনা আয়োগ বা National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWE) গঠন করে সরকার। কমিশনের প্রতিবেদনে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য পালনের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এর আগে ভার্মা কমিটি (১৯৯৯) মৌলিক কর্তব্য

[লেখক রাঁচির National University of Study and Research in Laws-এর অধ্যাপক। ই-মেল : jha.anubhav87@gmail.com]

পালনের বিষয়টি কার্যকর করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছিল।

কর্তব্যের ধারণাটি সংবিধানে আগে থেকেই ছিল

নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় ৪২-তম সংশোধনীর মাধ্যমে। তবে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত ধারণা সংবিধানে জায়গা করে নিয়েছে প্রথম থেকেই। ভালোভাবে পড়লেই তা বোঝা যায়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস এবং উপাসনার অধিকারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্নে সমতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। এরই সঙ্গে, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষায় দায়িত্ব বর্তায় নাগরিকদের ওপর, এমনটাও বলা হয়েছে সেখানে। পরে, মৌলিক দায়িত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়ের পাশাপাশি সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়গুলিও যোগ করা হয়েছে প্রস্তাবনায়।

NCRWC-র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধান প্রণেতাদের বিশ্বাস ছিল মৌলিক কর্তব্যগুলি আপনা থেকেই পালন করবেন নাগরিকরা। আলাদাভাবে তা বলার দরকার নেই। তাছাড়া, গণপরিষদ (Constituent Assembly)-এর যে প্রস্তাবকে ভিত্তি করে ভারতের সংবিধান রচিত সেখানেই নাগরিকদের কর্তব্যের বিষয়টি রয়েছে। আর, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মৌলিক কর্তব্যের ধারণাটিও স্পষ্ট। মৌলিক কর্তব্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তির আগেই ১৯৬৯ সালে চন্দ্রমোহন বোর্ডিং বনাম মহীশূর সরকার (রাজ্য) মামলায় (1970, AIR 2042) সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে :

"সংবিধানে শুধু অধিকার দেওয়া আছে, দায়িত্ব দেওয়া নেই এমন ধারণা ভুল। তৃতীয় অধ্যায়ে আওতায় প্রদত্ত অধিকারসমূহ যেমন মৌলিক, ঠিক তেমনই চতুর্থ অধ্যায় নির্দেশিত বিষয়গুলি। দেশের প্রশাসনের প্রশ্নে তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। তারা পরস্পরের কাছে পরিপূরক এবং সহায়ক। চতুর্থ অধ্যায়ের সংস্থানগুলি নাগরিকদের ওপর বেশ কিছু কর্তব্যের দায়ভার চাপানোর ক্ষমতা দিয়েছে আইনসভা এবং সরকারের হাতে। ভাবনাচিন্তা করেই এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তার সুযোগ রাখা হয়েছে; কারণ নির্দেশমূলক নীতি কতটা কার্যকর করা হবে তার ভিত্তিতেই নাগরিকদের ওপর চাপানো হবে কর্তব্যপালনের দায়ভার"।

কর্তব্যসমূহের উল্লেখের কারণ

জাতির একক হলেন নাগরিকরা। হ্যারল্ড ল্যাস্কি-র মতে, অধিকারের সঙ্গে সক্রিয়তার যোগাযোগ রয়েছে এবং সেই অধিকার পাওয়া যেতে পারে কিছু কর্তব্য সম্পাদনের বদলে। সংবিধান রচনার সময় প্রণেতারা আলাদাভাবে কর্তব্যের তালিকার উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। কিন্তু পরে এই প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। মৌলিক কর্তব্যের বিষয়ে ভার্মা কমিটির অভিমত হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ, বিশেষত জনজীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধের ধারাবাহিক অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেজন্যই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র একটি চিঠিতে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতিকে লিখেছেন, সমাজ যদি কর্তব্যসচেতন হয়, তাহলে ভারতের প্রতিটি মানুষ কর্তব্যপালনে যত্নবান থেকে নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। কাজেই, কর্তব্যসমূহের সুনির্দিষ্ট উল্লেখের মূল লক্ষ্য হল কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকদের ধারাবাহিকভাবে সচেতন রেখে দেশের সার্বিক উৎকর্ষসাধনের পথে অগ্রসর হওয়া।

সংবিধানের ৫১(ক) ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের কাছে যা প্রত্যাশিত

সংবিধানের ৫১(ক) ধারার সংস্থানগুলি প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়, প্রত্যাশামূলক।

বলা হয়েছে যে নাগরিকরা সংবিধানের নির্দেশাবলী মেনে চলবেন এটাই কাম্য। জাতীয় পাতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে নাগরিকদের। দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীন হয়েছে ভারত। স্বাধীনতার লড়াইয়ের আদর্শে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত থাকতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং ঐক্য রক্ষায় ব্রতী হতে হবে সকলকে। প্রয়োজনে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন নাগরিকরা।

ধর্মীয়, আঞ্চলিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ভারতের নাগরিকদের অনুসরণ করতে হবে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ। মহিলাদের সম্মানহানি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন নাগরিক সমাজ। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরম্পরার সংরক্ষণ অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্দেশিকা অনুযায়ী (Directive Principles of State Policy), পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় আইন প্রণয়ন করবে সরকার। পাশাপাশি, এক্ষেত্রে নাগরিকরাও সংবেদনশীল এবং উদ্যোগী হবেন। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদী সংস্কারের মনোভাবে জারিত হতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষকে। প্রতিবাদ-

বিক্ষোভের নাম করে অনেক সময় সরকারি সম্পত্তিহানিতে শামিল হয় অনেকে। তা একেবারেই কাম্য নয়।

রাষ্ট্র বিকশিত হয় নিজের নাগরিকদের হাত ধরেই। কাজেই, ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষসাধনে উদ্যোগী হতে হবে নাগরিক সমাজকে। তার ওপর ভিত্তি করেই উন্নয়ন ও সাফল্যের সোপান বেয়ে এগিয়ে চলবে দেশ।

মৌলিক কর্তব্যপালনে নাগরিকদের বাধ্য করা

এক্ষেত্রে সংবিধানে তেমন কোনও সংস্থান নেই। বিষয়টি অনেকটাই ঐচ্ছিক। তবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের পক্ষে হানিকর কাজে লিপ্তদের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় বেশ কিছু সংস্থান প্রযুক্ত হতে পারে। মহিলাদের প্রতি অপরাধ কিংবা সরকারি সম্পত্তিহানির মতো কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে ভারতীয় দণ্ডবিধি। অরণ্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে আইন রয়েছে। কিন্তু, সে অনুযায়ী শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার আগেই মূল্যবোধের তাগিদে নাগরিকরা এইসব আইনের মূল লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এমনটাই প্রত্যাশা।

AIIMS Students Union-AIMMS and Ors. (AIR 2001 SC 32.62) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে তার নির্যাস হল যে, মৌলিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষে ততটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া কঠিন যতটা সম্ভব মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১(ক) ধারার কথা ভুললে চলবে না। এখানে 'মৌলিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; যেমনটি হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে অধিকার শব্দটির আগে 'মৌলিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সংবিধানের প্রণেতারা। বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবিকতার নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া উচিত প্রত্যেক নাগরিকেরই। দেশকে সাফল্যের সোপান বেয়ে ধারাবাহিকভাবে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্তরে উৎকর্ষসাধনের পথে এগোন প্রতিটি নাগরিকের করণীয়। রাষ্ট্র হল নাগরিকদের সমষ্টি। কাজেই ৫১(ক) ধারা সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট করে না দিলেও প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যের সমষ্টিগত রূপই হল সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রতিফলন।

ভারত সরকার বনাম নবীন জিন্দল (2004 2 SCC 510) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যে ফুটে উঠেছে ভার্মা কমিটির বক্তব্যই :

'ব্যক্তি কর্তব্য পালন করে নিজের সামাজিক এবং পরিবেশগত আবহের অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রভাবে, কিংবা আইন অনুযায়ী শাস্তি পাওয়ার ভয়ে। কর্তব্যপালনে নাগরিকদের বাধ্য করতে প্রয়োজনমতো উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা জরুরি। সেক্ষেত্রে আইনের সংস্থান বর্তমান না থাকলে বা অপ্রতুল হলে সেই শূন্যতা দূর করতে হবে। আইনি সংস্থান থাকা সত্ত্বেও যদি নাগরিক তা উপেক্ষা করে নিজের কর্তব্যপালনে অনাগ্রহী হন তাহলে আইনটির যথাযথ প্রয়োগে উদ্যোগ নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নিছক আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার এবং অনুসরণীয় ব্যক্তির আদর্শের প্রসঙ্গ তুলে ধরলে কাজ হবে বেশি।'

শেষ কথা

সংবিধান দেশের মানুষকে কিছু মৌলিক অধিকার দিয়েছে। গণতান্ত্রিক রীতির আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত সকলের। এই বিষয়টি নাগরিকদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দেওয়ার জন্যই প্রাসঙ্গিক 'মৌলিক কর্তব্য'-এর ধারণা। ভারতীয় সমাজ কর্তব্যনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক অতীতে অধিকারের বিষয়টিও খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলাফলের কথা চিন্তা না করে কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নিশ্চল থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে 'গীতা'য়। আবার Locke-এর 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব অনুযায়ী 'নাগরিক'দের অধিকার রক্ষা এবং কর্তব্যপালন, দু'টি দিকই গুরুত্বপূর্ণ। ৫১(ক) ধারা সাধারণ নাগরিকদের মতো সরকারি পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিতদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নাগরিকদের তরফে মৌলিক অধিকার পালনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করায় সহায়ক কয়েকটি আইনের উল্লেখ রয়েছে ভার্মা কমিটির বক্তব্যে। 'মৌলিক কর্তব্য'-এর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তারও অতিরিক্ত অনেক কিছুই করতে পারেন নাগরিকরা। ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের বিস্তার ঘটাতে হবে আরও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিতে হবে 'মৌলিক কর্তব্য'-এর পাঠ। আবার নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা দরকার। অধিকার এবং কর্তব্য কোনও কিছুই শুধুমাত্র খাতায়-কলমে থাকলে চলবে না। 'মৌলিক কর্তব্য'-এর বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলে বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটাতে চাই আন্তরিক এবং ধারাবাহিক উদ্যোগ।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Basu, D.D., 2008. Commentary on the Constitution of India, Vol. III.

(২) Bhatia, Gautam. Rights, Duties and the Constitution. *The Hindu*, 26th February, 2020 https://www.thehindu.com/opinion/lead/rights-duties-and-the-constitution/article30915951.ece

(৩) Deshpande, V.S., 1973. Rights and Duties under the Constitution. *Journal of the Indian Law Institute*, *15*(1), pp94-108.

(৪) National Commission to Review the Working of the Constitution Report, Available at: http://legalaffairs.gov.in/ncrwc-report.

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন

ড. আর. এস. বাওয়া

দেশের সকল আইনের মূলে রয়েছে ভারতীয় সংবিধান। অর্থাৎ, সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলির সকল আইনেরই কর্তৃত্ব আহরিত হয়েছে সংবিধানের কাছ থেকে। ভারতীয় গণতন্ত্রের তিন স্তম্ভের (আইনসভা, প্রশাসন বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা) কর্তৃত্বের মূলে রয়েছে এই সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলই। সংবিধান রয়েছে বলেই ভারতের প্রশাসন যন্ত্র সুপরিচালিত হতে পেরেছে।

একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র গঠন করতে আমাদের এই মহান দেশের ইতিহাসে ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা অনন্য। এটির প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধকরণে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সর্বাধিক সুসংবদ্ধ ও দীর্ঘতম লেখ্যসমূহের মধ্যে একটি। ভারতের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন এতেই বিধৃত হয়েছে। সংবিধানেই রয়েছে রাষ্ট্র প্রশাসনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতে দু'টি অস্তিত্ব বা স্বতন্ত্র সত্তা লক্ষ্য করা যায়, একদিকে ব্রিটিশ সরকার, অন্যদিকে বিভিন্ন করদ রাজ্য। সংবিধানে এই বিভাজনের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশের সকল আইনের মূলে রয়েছে ভারতীয় সংবিধান। অর্থাৎ, সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলির সকল আইনেরই কর্তৃত্ব আহরিত হয়েছে সংবিধানের কাছ থেকে। ভারতীয় গণতন্ত্রের তিন স্তম্ভের (আইনসভা, প্রশাসন বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা) কর্তৃত্বের মূলে রয়েছে এই সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলই। সংবিধান রয়েছে বলেই ভারতের প্রশাসন যন্ত্র সুপরিচালিত হতে পেরেছে।

ইতিহাস

আমাদের সংবিধানের ইতিহাস খুবই আগ্রহোদ্দীপক; কারণ এই ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি কেমনভাবে এবং কী জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকেই আমরা বেছে নিয়েছিলাম। সপ্তদশ দশকে বাণিজ্যিক স্বার্থেই ব্রিটিশদের এদেশে আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করে এবং আরও এগিয়ে গিয়ে রাজস্ব আদায় এবং স্বশাসনের ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এসব উদ্দেশ্যসাধনে তাদের নানা প্রকার আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা চালু করতে হয়েছিল। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন মোতাবেক বাংলার গভর্নর জেনারেল ভারতেরও গভর্নর জেনারেল হয়ে ওঠেন। এরপর একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা সৃষ্টি করে

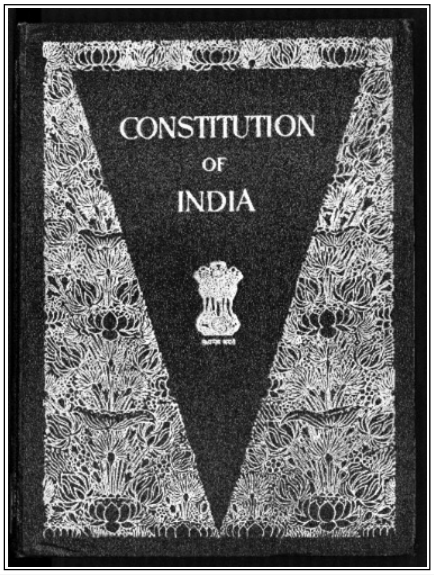

ব্রিটিশরাই এদেশের সর্বোচ্চ শাসককূলে পরিণত হয়। ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটায়। তখন থেকে ব্রিটিশ রাজই ভারতের প্রকৃত শাসক হয়ে উঠে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের ওপরই ন্যস্ত হয় ভারত শাসনের দায়িত্বভার।

ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আসে ১৮৬১, ১৮৯২ ও ১৯০২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল আইনগুলি বলবৎ হবার দরুন। এরপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কয়েকটি প্রদেশের (রাজ্য) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত করে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আইন প্রণয়নের দ্বারা সকল প্রদেশ ও রাজ্য আইন পরিষদের সুযোগ পায়।

ব্রিটিশ শাসকরা সেই সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিতে স্বতন্ত্র্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কাঠামো প্রবর্তন করে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় ভোটদাতারা এই প্রথমবার তাদের প্রতিনিধি বেছে নেবার সুযোগ পেলেন। আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং উভয়কক্ষীয় এই প্রশাসন কাঠামোকেই পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অনুসরণ করা হয়েছিল।

[লেখক মোহালিস্থিত চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ই-মেল : vc@cumail.in]

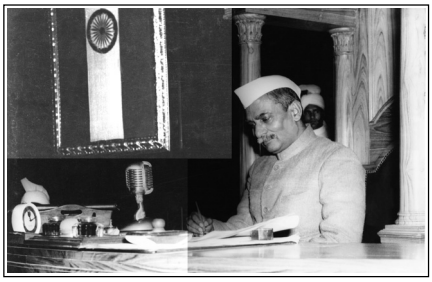

ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আইনের বিধিবদ্ধকরণ। এই আইনবলেই শাসন কাজ পরিচালনায় ক্ষমতার বিভাজন এনে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় তালিকা, প্রাদেশিক তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা প্রবর্তিত হয়। ক্ষমতার এই বিভাজন প্রক্রিয়াটি পরে স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সংবিধানেও অনুসৃত হয়। এর ফলে স্বশাসনের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির স্বাধীনতা আরও বিস্তারিত হয়। ১৯৩৫ সালের আইন মোতাবেক যে ফেডারেল কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল সেটিই আজ সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা পেয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হল ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। এই আইন কার্যকর হবার দরুন আমাদের দেশও সার্বভৌম হয়ে ওঠে। কার্যত এই আইনকেই ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্থাপন করা ছাড়াও ভারতের সংবিধান সভা বা গণপরিষদ গঠনের সূত্রপাত।

গণপরিষদ

১৯৪৬-এর মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় উল্লেখিত সংস্থানের ভিত্তিতে ভারতের গণপরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সার্বভৌম ক্ষমতাকে এবার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার কাজকে সুগম করা। আরও স্থির হয়েছিল যে তদানীন্তন বিভিন্ন করদ রাজ্য এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সূত্র অনুযায়ী গণপরিষদ গঠন করা হবে। সেইমতো গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনিক সংস্কার কার্যালয়ের পরিচালনায় ১৯৪৬-এর শেষ নাগাদ নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হয়। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যরাই পরোক্ষ নির্বাচন রীতির ভিত্তিতে গণপরিষদের সদস্যবর্গকে নির্বাচিত করেন। এই গণপরিষদকেই ভারতের প্রথম সংসদ বলা যেতে পারে। দিল্লিতে পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে এবং পরিষদের পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভারতের জাতীয় পতাকা, জাতীয় চিহ্ন এবং জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

স্বাধীনোত্তর পর্বে এই পরিষদের নির্বাচনে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ চেয়ারম্যান পদে বৃত হন, ভাইস-চেয়ারম্যান হন ভি. টি. কৃষ্ণমাচারি এবং এইচ. সি. মুখার্জি। এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার গণপরিষদের মহাসচিব এবং এস. এন. মুখার্জি মুখ্য খসড়া প্রণেতা হন। আর সেইসঙ্গে শুরু হয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ, যে খসড়া কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন ডক্টর ভি. আর. অম্বেডকর, আমাদের কাছে যার আর এক পরিচিতি ভারতীয় সংবিধানের জনকরূপে।

সংবিধান রচনা প্রক্রিয়ায় এমন অনেকের সাহায্য নেওয়া হয় যারা কিন্তু আদতে গণপরিষদের সদস্য ছিলেন না। নির্দিষ্ট বিষয়মুখী আলোচনাকে মাঝে মাঝে আরও নিবিড় করে তোলার উদ্দেশ্যে সদস্য নন অথচ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি বা কৃতিত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গণপরিষদ দ্বারা গঠিত কমিটিগুলিতে স্থান দেওয়া হ'ত। পদ্ধতিগত এবং বাস্তবভিত্তিক, উভয় দিক থেকে যাচাই করলে দেখা যায় যে সংবিধান তৈরির অনেক কাজই ওইসব কমিটির বৈঠকে সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য এটাও উল্লেখ করা দরকার যে গণপরিষদের পক্ষ থেকে ঠিক কয়টি এধরনের কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেসম্পর্কে জনসমক্ষে আনার মতো কোনও সরকারি নথিপত্র পাওয়া যায় না। প্রয়োজন সাপেক্ষে কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ত এবং যথোচিত আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ত। বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন বা নির্বাচনপর্ব কতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে তারই মাপকাঠি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের ব্যবধানে তাদের নিয়োগপত্র পেয়ে যেতেন। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় মন্তব্য সংকলন করে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। এই বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য কোনও প্রস্তাব ছিল না এবং ঠিক কী উদ্দেশ্যে বা কোন পটভূমিকায় এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেবিষয়েও কিছু জানা যায় না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ১০-১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ওই বিশেষ কমিটির বৈঠকে ৩২ জন সদস্য অংশ নেন। দুই বছরে বেশি সময় ধরে বিস্তারিত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক শেষে আমাদের সংবিধান গণপরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদন পায় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৯। দেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার জন্য পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গণপরিষদে গৃহীত হয়।

ভারতের সংবিধান একটি অভিনব ও সুসংবদ্ধ লেখ্য; যেখানে আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

এতে রয়েছে বিভিন্ন নৈতিক বিধিবিধান এবং সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে দেশের সরকারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগের পন্থাপদ্ধতি। সংস্কৃতি, নাগরিকত্ব ইত্যাদি নানা দিক থেকে ভারত এক বহুধাবিভক্ত দেশ এবং ঠিক এই কারণেই খসড়া কমিটির কাজ সম্পন্ন করতেও এত দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ভারতীয় সংবিধানের ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন দিক এই নিবন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। একাধিক দেশের একেক রকম সংবিধান আমাদের সংবিধানকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং এই সংবিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিগত বছরগুলিতে যথাযোগ্যভাবে অটুট থেকেছে।❑

আদালতের রায় বনাম সংবিধান সংশোধনী

এন. এল. রাজাহ

প্রথম সংবিধান সংশোধনী সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, খুব হাতে গোনা সংশোধনীই তা ফেলতে পেরেছে। সেইজন্যই আজও এটিকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। আগামীদিনেও এটি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক চলবে এবং সময়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর প্রয়োগও চলতে থাকবে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। এর থেকেই জন্ম হয়েছিল একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের। অনেক ভাবনাচিন্তা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের এই অসাধারণ সংবিধান গড়ে উঠেছে। এর সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে দেশের সেরা কিছু মস্তিষ্কের অবদান। তাহলে এত তাড়াতাড়ি এই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

আসলে প্রয়োজনটা হয়েছিল কয়েকটি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কিছু রায়ের সুবাদে। এইসব রায়ে সংবিধানকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যা তৎকালীন শাসক শ্রেণির করা ব্যাখ্যা বা তারা যেভাবে সংবিধানের ব্যাখ্যা হোক বলে চাইছিলেন, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

সাংবাদিক রমেশ থাপার, তারা প্রকাশিত ইংরাজি সাপ্তাহিক "Crossroads"-এর ওপর চাপানো নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। একইরকমভাবে ধর্মীয় আবেগে আঘাত করার দায়ে দিল্লিতে একটি প্রকাশনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তারাও আদালতে এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। (ব্রিজ ভূষণ ও অন্যরা বনাম দিল্লি রাজ্য)। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই নিয়ন্ত্রণকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার বিখ্যাত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে, মত প্রকাশের অধিকার খর্ব করার জন্য যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলির কথা সংবিধানের ১৯(২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে "আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা" পড়ে না।

এছাড়া ভূমি সংস্কার নিয়েও আদালতের সঙ্গে শাসন বিভাগের মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল। জমিদার প্রথার অত্যাচারের অবসান ঘটাতে কয়েকটি রাজ্য জমিদারদের অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের জমি বণ্টন করে দিয়েছিল। এই উদ্যোগকে কয়েকটি হাইকোর্ট অসাংবিধানিক আখ্যা দেয়। এর মধ্যে পাটনা হাইকোর্টে কমলেশ্বর সিং বনাম বিহার রাজ্য মামলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সালের ১২ মার্চ হাইকোর্ট রায় দেয়, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করায় বিহার ভূমি সংস্কার আইন অবৈধ। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় আইনের আওতায় সবার সমান সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, তাই ধনী জমিদারদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অসাংবিধানিক। জমি অধিগ্রহণ করলে, তা সে কোনও দরিদ্র মানুষের থেকে করা হোক বা জমিদারের থেকে, ক্ষতিপূরণ সমহারে দিতে হবে বলে আদালত রায় দেয়।

এই মামলাগুলির সঙ্গে জড়িত আইন ও ধারাগুলি আলাদা আলাদা ছিল। যেমন, রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় ১৯৪৯ সালের Madras Maintenance of Public Order-কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আবার, ব্রিজ ভূষণ বনাম দিল্লি রাজ্য মামলায় চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল ১৯৪৯ সালের East Punjab Public Safety Act-কে তবে আইন আলাদা আলাদা হলেও সবক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্ট একটিমাত্র বিষয়ই বিবেচনা করেছিল, আর তা হল, এই সংস্থানগুলি কি সাংবিধানিকভাবে বৈধ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উত্তর নেতিবাচক ছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি সংস্থানগুলি খারিজ করে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত 'Doctrine of Over breadth' প্রয়োগ করেছিল। আদালত বলে, "আইন-শৃঙ্খলা" জনজীবনে শান্তি ও সুস্থিতির সঙ্গে সমার্থক। এর অবহেলা করা হলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে নড়বড়ে করার লক্ষ্যে করা কাজও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এটা বলা যায় না যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবার আশঙ্কা রয়েছে, এমন যেকোনও কাজই রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে। ফলে সংবিধানের ১৯(২)

[লেখক মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিয়োজিত বরিষ্ঠ আইনজীবী। ই-মেল : nlrajah.advocate@gmail.com]

ধারা নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় না। যেসব ক্ষেত্রে এমনটা করা হয়েছে, সেখানেই আদালত সেই আইনকে "Over board" বলে তাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে।

রমেশ থাপার ও ব্রিজ ভূষণের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এও বলে, সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাগুলিতে 'আগাম নিয়ন্ত্রণ'-এর ধারণা কায়েম করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি প্রয়োগ করে সরকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় সংবাদপত্রের প্রকাশ এবং বিতরণও বন্ধ করে দিতে পারে। এটা কিছু বলার আগেই মুখ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার শামিল। আইনের সাধারণ স্বীকৃত প্রথা এবং মার্কিন সাংবিধানিক আইনশাস্ত্র অনুসরণ করে আদালত বলে, এই ধরনের আগাম নিয়ন্ত্রণ সংবিধানসম্মত হওয়া খুব কঠিন।

এই রায়গুলির প্রেক্ষিতে জওহরলাল নেহরু-র মনে হয়, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগের কাজে অনভিপ্রেতভাবে হস্তক্ষেপ করছে। তিনি আদালতকে মনে করিয়ে দেন, "খুব সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রেও আদালত যদি সংবিধানের এমন ব্যাখ্যা দেন, যা শাসন বিভাগের কাজের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আইন প্রণেতাদের সংবিধান সংশোধনের কথা বিবেচনা করে দেখা ছাড়া উপায় থাকে না। একমাত্র তাহলেই সাধারণ মানুষের ইচ্ছা মর্যাদা পাবে এবং আইনে তার প্রতিফলন ঘটবে।"

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সংসদের এই সম্মিলিত উদ্বেগের প্রেক্ষিতেই আমাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রথম সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাবের সময়ে যে অনন্যসাধারণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা একটু বিশদে বলার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীন ভারতের গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচন হওয়ার কথা, ১৯৫১ সালের শেষ পর্যন্ত তার আয়োজন করা যায়নি। সংবিধান সংশোধনের বিপক্ষে যারা ছিলেন, তারা বললেন, যেহেতু সংসদে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এখনও আসেনি, তাই এই অবস্থায় সংবিধান সংশোধন করা ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের আইনগত এক্তিয়ার নিয়ে কোনও দ্বিমত ছিল না। এর কারণ হল, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে যতদিন না নতুন সংবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হচ্ছে, ততদিন আইনগত সব ক্ষমতা গণপরিষদের ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, লক্ষ করার বিষয় হল, সংবিধান সংশোধন নিয়ে তাদের মধ্যেই বিতর্ক দেখা দিল, যারা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন!

সংসদে তুমুল বিতর্ক হল মূলত দু'টি প্রশ্নকে ঘিরে। প্রথমটি হল, সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায় পালটে দেওয়ার ক্ষমতা সংসদের রয়েছে কিনা এবং দ্বিতীয়টি হল, যে পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা কতটা?

ষোল দিন ধরে সংসদে আগুনঝরা বিতর্ক ও বক্তব্য পেশের পর সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। তবে ১৯ নম্বর ধারায় যে পরিবর্তন নেহরু চেয়েছিলেন, অনুমোদিত সংশোধনী তার থেকে অনেক নরম হল। এই বিতর্কের সঠিক চরিত্র এবং এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সাংসদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তার এক মনোগ্রাহী বিবরণ পাওয়া যায় "Sixteen Stormy days—The story of the First amendment to the Constitution of India" বইতে।

প্রথম সংশোধনীর নেপথ্যে থাকা ঘটনাবলী ও পেশ করা যুক্তির মাধ্যমে সরকারের উদ্বেগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা হয়েছিল :

"সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গত পনেরো মাসে আদালতের রায় ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে। সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারায় নাগরিকদের মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কোনও কোনও আদালত তাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে কোনও ব্যক্তি খুন ও অন্যান্য অপরাধের হুমকি দিলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। অন্য যেসব দেশে লিখিত সংবিধান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত সংবাদমাধ্যম রয়েছে, সেখানে কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহারকারীদের শাস্তি দিতে রাষ্ট্রকে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। নাগরিকদের যেকোনও পেশা, জীবিকা ও ব্যবসায় নিয়োজিত থাকার যে অধিকার সংবিধানের ১৯(১)(জি) ধারায় দেওয়া হয়েছে, তার ওপর রাষ্ট্র 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে' যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। সংবিধানে বর্ণিত এই সংস্থানের সুবাদে রাষ্ট্রীয়করণের যেকোনও উদ্যোগ সরকার নিতে পারলেও এই বিষয়টি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে ১৯(৬) ধারায় একটি ব্যাখ্যা সংযোজনের প্রয়োজন। এছাড়া সংবিধানের ৩১ নম্বর ধারা নিয়েও অনভিপ্রেত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত তিন বছরে ভূমি সংস্কার নিয়ে রাজ্য বিধানসভাগুলি যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সংবিধানের ৩১ নম্বর ধারার (৪) ও (৬) উপধারায় তার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও

সেগুলির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর ফলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা বহু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে, সেগুলি রূপায়িত হতে পারছে না।

এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হল, উপরে বর্ণিত কারণে সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারার সংশোধন করে এমন কিছু সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে জমিদারি অবলুপ্তি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন উঠতে না পারে। এর পাশাপাশি সম্ভাব্য সমস্যা এড়াতে অন্য কয়েকটি ধারাতেও ছোটোখাটো কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হচ্ছে।"

প্রথম সংবিধান সংশাধনীতে সংবিধানের ১৫, ১৯, ৮৫, ৮৭, ১৭৪, ১৭৬, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭২ এবং ৩৭৬ ধারার সংশোধন করা হয়েছিল এবং সংযুক্ত হয়েছিল ৩১এ ও ৩১বি ধারা।

৩১বি ধারার মাধ্যমে এই সংশোধনীতে নবম তপশিলকেও সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ে সংবিধানে ৭ ধরনের অধিকারের কথা বলা ছিল। এগুলি হল :

সমতার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অধিকার, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার এবং সাংবিধানিক সুরাহার অধিকার।

১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন একটি ধারা ৩০০এ সংযোজিত করে একে সাধারণ আইনি অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। সেজন্য বর্তমানে ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার রয়েছে।

নবম তপশিলে যেকোনও আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা বিচার বিভাগীয় নিরীক্ষণের আওতায় আর থাকে না। এমনকি সেটি অসাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী হলেও তার কোনও প্রতিকার নেই। ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত ১৩-টি আইন নিয়ে এই তালিকার সূচনা হয়েছিল, আর আজ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, দাম ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-সহ ২৮২-টি আইন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রথম সংবিধান সংশোধনী নিয়ে অনেক মামলা ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সংশোধিত ১৯(২) ধারার ব্যাখ্যা প্রথম দেয় রামজী লাল মোদী বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায়। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় আমরা দেখেছি, বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করতে সুপ্রিম কোর্ট কতটা উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু প্রথম সংবিধান সংশোধনীর পর আদালতের এই অবস্থান কতটা বদলে যায়, তা রামজী লাল মোদী মামলার রায় থেকেই স্পষ্ট। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫এ ধারায় কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলা হয়, ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতের জেরে কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা থাকলেও সবক্ষেত্রে তা নয়। তাই এই সংস্থানটি অসাংবিধানিক। আদালত কিন্তু এই যুক্তি খারিজ করে দিয়ে সংস্থানটি বহাল রাখে।

গত কয়েক দশকে বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের রক্ষক হিসাবে আদালত আরও বেশি করে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাক্‌স্বাধীনতার ফলেই যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, অর্থাৎ, পরিস্থিতি যে 'বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ'-এর মতো হয়েছিল, এস. রঙ্গরাজন বনাম পি. জগজীবন রাম মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার প্রমাণ দিতে বলে। খুব সম্প্রতি অরূপ ভুয়ান বনাম অসম রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট TADA-র একটি সংস্থানের প্রয়োগ সঙ্কীর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ওই সংস্থানে কোনও নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদে থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কেবল নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদে থাকলেই হবে না, এই ব্যক্তি কোনও হিংসায় প্ররোচনা দিয়েছেন, তার প্রমাণ থাকলে তবেই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

শ্রেয়া সিংঘল বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা বাতিলের মধ্য দিয়ে আদালত আবারও বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের সাংবিধানিক রক্ষক হিসাবে নিজের ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ধারায় কম্পিউটার বা অন্য কোনও সংযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে 'আপত্তিকর' মেসেজ পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে শাস্তিবিধানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই ধারা খারিজ করে দিয়ে আদালত বলে, ''আমরা মনে করি, এই ধারা অসাংবিধানিক। এর আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার হাতে থাকা ক্ষমতা, ক্ষতিহীন নির্দোষ মেসেজ প্রেরকদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করতে পারে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এটি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং সেজন্য এটি খারিজ করা হল।"

অর্থাৎ, যে "Over breadth"-এর ধারণায় রমেশ থাপার মামলায় আদালত সংশ্লিষ্ট সংস্থান খারিজ করেছিল, সেই একই কারণে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাও বাতিল করে দেওয়া হয়।

প্রথম সংবিধান সংশোধনী সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, খুব হাতে গোনা সংশোধনীই তা ফেলতে পেরেছে। সেইজন্যই আজও এটিকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। আগামীদিনেও এটি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক চলবে এবং সময়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর প্রয়োগও চলতে থাকবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) 1950 AIR 129, 1950 SCR 605
(২) 1950 AIR 124, 1950 SCR 594
(৩) AIR 1951 Pat' 91 (SB) (A).
(৪) Supra
(৫) Supra
(৬) Supra
(৭) Supra
(৮) "Sixteen Stormy days: The story of the First amendment to the Constitution of India" by Tripurdaman Singh
(৯) 1957 AIR 620, 1957 SCR 860
(১০) Supra
(১১) 1989 SCR (2) 204, 1989 SCC (2) 574
(১২) Indian Kanoon - http://indiankanoon.org/doc/792920/
(১৩) Shreya Singhal v. Union of India, (2015) 5 SCC 1

ভারতের সংসদ : কাজের খতিয়ান ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

এম. আর. মাধবন

ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংসদ। সংসদ নাগরিকদের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সত্তর বছর ধরে ভারতের সংসদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশটির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করেছে সংসদ। সংসদ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতের প্রধান আইনসভা হওয়ার দরুন সংসদকে মূলত চারটি দায়িত্ব পালন করতে হয় : সংসদ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগকে তার নিজের কাজকর্মের প্রতি দায়বদ্ধ রাখে, সরকারের অর্থসংস্থান করে এবং জনসাধারণের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। সংসদ একটি সাংবিধানিক সংস্থা। কারণ সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

সংসদের কাজকর্ম

বেশ কয়েক বছর হল সংসদের অধিবেশনের দিনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। চিত্র-১ নং-এ দেখতে পাই যে ১৯৫০-এর দশকে যেখানে গড়ে ১২৫-১৪০ দিন সংসদের অধিবেশন বসত গত কুড়ি বছরে সেটা কমতে কমতে ৭০ দিনে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, সদস্যদের নানান বিক্ষোভের ফলে সংসদে আলাপ-আলোচনার জন্য বরাদ্দ সময়ও কমে এসেছে। ১৫-তম লোকসভায় নানা বিক্ষোভের জেরে নির্ধারিত সময়ের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়েছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

এর ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব মার খাচ্ছে। বিক্ষোভের জেরে সভা পণ্ড হয়ে গেলে অনেক সময় রাতের দিকে বা মধ্যাহ্নভোজের সময়েও সভা বসে। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্বের যে সময় নষ্ট হয়ে যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। তার ফলে মৌখিক উত্তরের জন্য যে অল্প ক'টি প্রশ্ন নথিভুক্ত হয় সংসদে একমাত্র সেগুলিরই উত্তর দেওয়া হয়। বাকি সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে লিখিত উত্তর দেওয়া হয় (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র-১
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশনের দিনের সংখ্যা করেছে

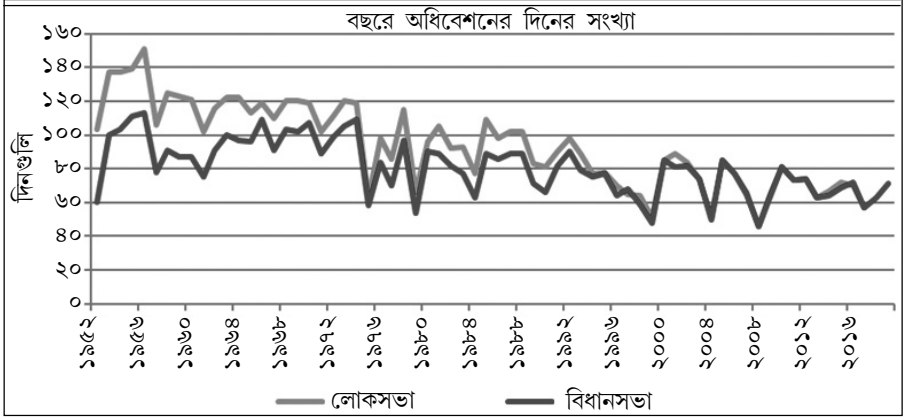

চিত্র-২
সদস্যদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য লোকসভার অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে

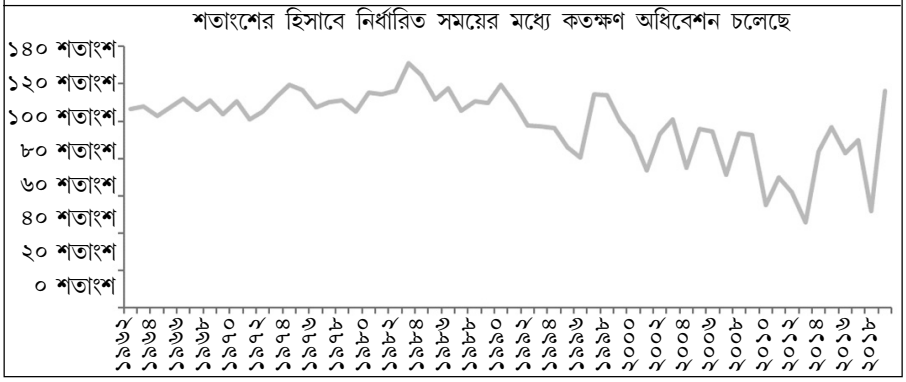

[লেখক নয়াদিল্লির পিআরএস লেজিসলেটিব রিসার্চের প্রেসিডেন্ট। ই-মেল : madhavan@prsindia.org]

চিত্র-৩
তারকাচিহ্নিত প্রশ্নগুলির সাতভাগের মধ্যে একভাগের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়েছে

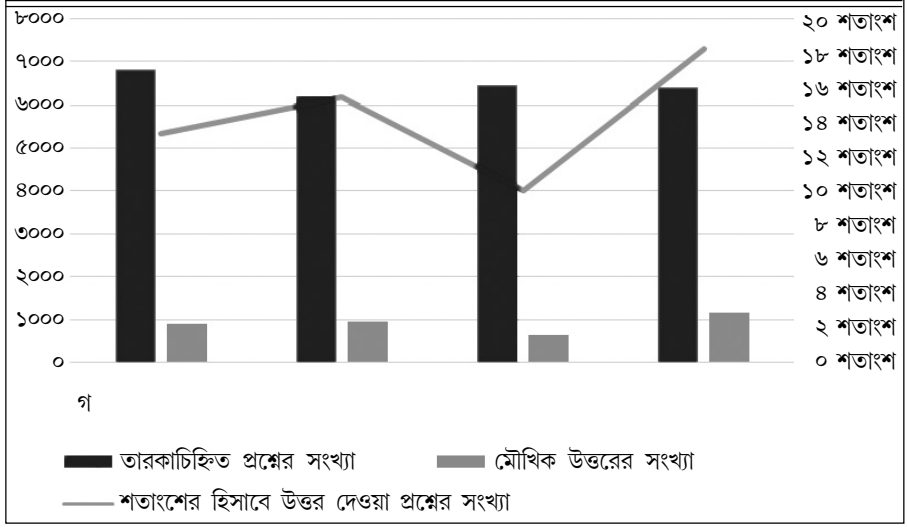

চিত্র-৪
পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা ছাড়াই অনেক বিল পাস হয়েছে

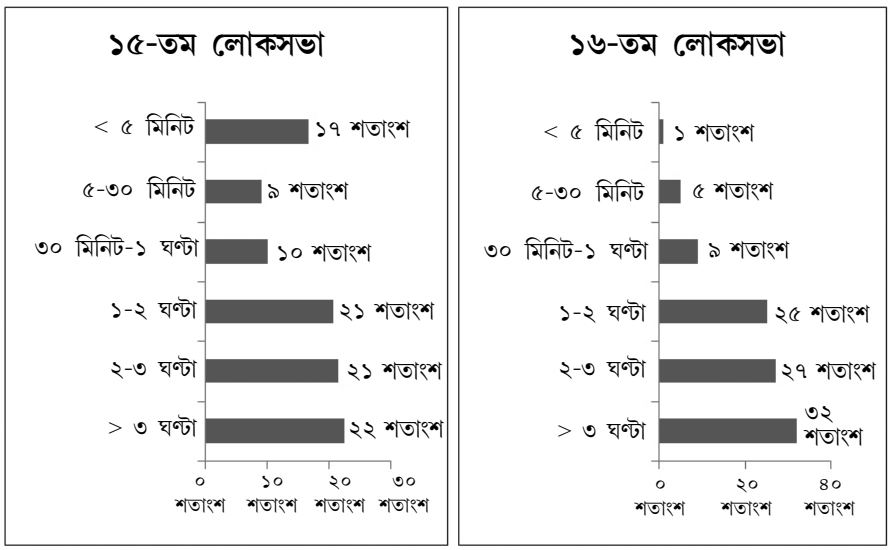

অধিবেশনের সময় কমে যাওয়ার ফলে কোনও বিল নিয়ে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয় না। বিল পেশ, পর্যালোচনা ও বিল পাস, এই তিনটি স্তরের জন্য বিলের তিনটি পাঠ তৈরি করা হয়। পর্যালোচনার সময় বিলের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথম ও তৃতীয় পাঠের সময় সংসদে খুব কমই আলোচনা হয়। এমনকি, পর্যালোচনা পর্বেও অনেক সময় আলাপ-আলোচনা হয় না। তবে বিগত পাঁচ বছরের এই প্রবণতা কিছুটা কমেছে (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)।

সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্র

সংসদের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য কাঠামোগত কিছু সমস্যা দূর করতে হবে। যেমন দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সমস্ত বিল ও প্রধান প্রধান বিতর্কের সময় সমস্ত ভোট নথিভুক্ত করতে হবে এবং সেইসঙ্গে বিলগুলিকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির কাছে পাঠাতে হবে এবং কমিটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

দলত্যাগ বিরোধী আইন

১৯৮৫ সালের ৫২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দশম তপশিলটি যুক্ত করা হয়েছে। এই তপশিলে বলা হয়েছে যেকোনও সাংসদ দলত্যাগ করলে বা পার্টি হুইপ অমান্য করে ভোট দিলে তার সাংসদ পদ বাতিল করা হবে। এর মাধ্যমেই দলের সদস্যদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখে দলীয় নেতৃত্ব। কোনও সদস্য দলের এই নির্দেশ অমান্য করলে তিনি সাংসদ পদ হারাবেন। ফলে সেই আসনে আবার উপ-নির্বাচন হবে।

আমরা বলতে চাইছি যে এই দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে সংসদ সমস্ত আইনি প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তথা শাসন বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান করে এই আইনের ফলে সংসদের সেই ভূমিকাই খর্ব হয়ে যায়।

তার বিখ্যাত ভাষণে বার্ক বলেছিলেন যে, ''সংসদ হল আলাপ-আলোচনার একটা সভা এবং একজন সাংসদকে শুধু তার কাজ নয়, বরং তার সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্যই তার নির্বাচকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়''[১]। খসড়া সংবিধান পেশ করার সময় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আম্বেদকর। তিনি বলেছিলেন, প্রথমটিতে সুস্থিতি বেশি কিন্তু দ্বিতীয়টির দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। আর ভারতের মতো দেশে এই দ্বিতীয়টিরই প্রয়োজন। প্রশ্ন উত্থাপন, বিভিন্ন প্রস্তাব, যেমন, অনাস্থা প্রস্তাব, মুলতুবি প্রস্তাব তথা বিতর্ক ও ভাষণের মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে সরকারকে দায়বদ্ধ রাখা যায় বলে তিনি জানিয়েছিলেন[২]। নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া, সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সরকারকে দায়বদ্ধ রাখাটা প্রত্যেক সাংসদেরই কর্তব্য।

দলত্যাগ বিরোধী আইন এই নীতিকেই অস্বীকার করে। এই আইন সাংসদদের দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করে। সংসদে যদি একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাহলে কোনও বিল বা প্রস্তাব নিয়েই সুষ্ঠু আলোচনা হবে না, বা সেগুলির বিরোধিতাও করা যাবে না। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা না থাকায় কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় যে সূক্ষ্ম বিষয়গুলি জড়িত থাকে সেগুলি বোঝার

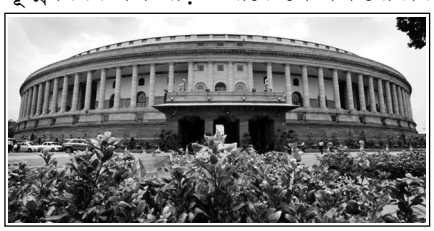

চিত্র-৫
দশ শতাংশের কম বিলে সদস্যদের ভোট নথিভুক্ত হয়েছে

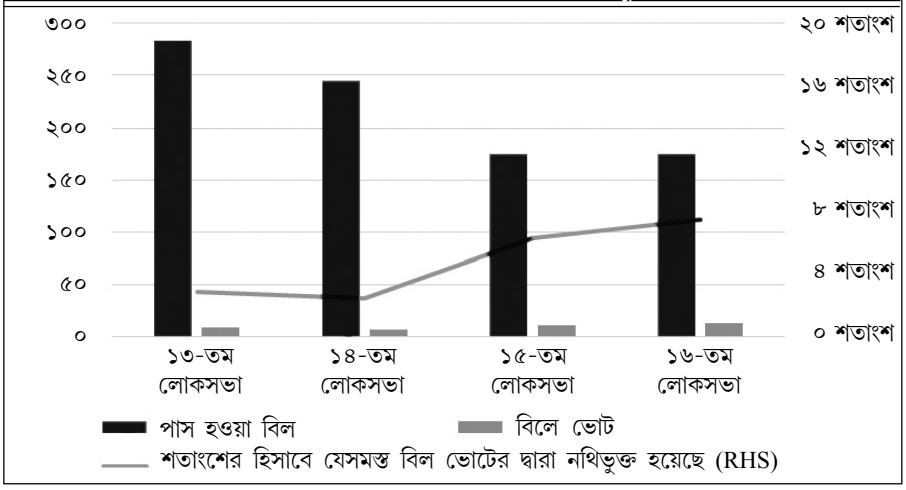

সময় বা আগ্রহ সাংসদদের থাকে না। তাই চিন্তাশীল মানুষজনের এই সভা দলীয় নেতাদের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যেক সাংসদ তার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। নিজের কাজের জন্য তিনি তার ভোটারদের কাছে দায়বদ্ধ। নির্দিষ্ট সময় ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাদেরও নিজেদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে হয়। তার মানে, তিনি যদি সংসদে তার ভোটারদের ঠিকমতো প্রতিনিধিত্ব করতে না পারেন তাহলে পরের নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে নিজেদের অসন্তোষ ব্যক্ত করতে পারেন ভোটাররা। কিন্তু দলত্যাগ বিরোধী আইন ভোটরদের প্রতি তাদের এই দায়বদ্ধতা পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় নির্দেশ মেনে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তা তার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের স্বার্থবিরোধী হতে পারে। তিনি শুধু একটাই যুক্তি দিতে পারেন যে পার্টি লাইন মেনেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ পাননি।

তবে মজার বিষয় এই যে, অনাস্থা প্রস্তাবের সময় এই আইনের খুব একটা বেশি প্রভাব পড়ে না। ২০০৮ সালে বামদলগুলি ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল তাতে পার্টি লাইন অমান্য করে ২১ জন সাংসদ ভোট দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশেও আমরা এই দৃষ্টান্ত পাই।

শাসন বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধানের যে ক্ষমতা সংসদের রয়েছে দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফলে তা খর্ব হয়েছে। এর ফলে নাগরিকদের কাছেও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা কমেছে। দলত্যাগের ফলে সরকার পড়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। তাই সংবিধানের এই অংশের পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে যে এই আইনটিকে প্রত্যাহার করা যায় কিনা।

ভোটের নথিভুক্তি

এই বিষয়টি ভোটারদের কাছে সাংসদদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি তুলে ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা গ্রেট ব্রিটেনের মতো গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যদের ভোটের নথি নাগরিকরা দেখতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যরা কী সিদ্ধান্ত নিলেন সেবিষয়ে ভোটার ও সংবাদমাধ্যম তাদের প্রশ্ন করতে পারেন এবং তাদেরও নিজেদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দিতে হয়। নির্বাচনের সময় এই তথ্য ভোটারদের খুব কাজে লাগে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে পারেন।

আমাদের সংসদে বেশিরভাগ বিল ও প্রস্তাবই পাস হয় ধ্বনিভোটে। যেসমস্ত সাংসদ কোনও প্রস্তাবের পক্ষে রয়েছেন স্পিকারের নির্দেশে তারা বলেন 'আই', আর যারা বিপক্ষে তারা বলেন 'নো'। তারপর স্পিকার খতিয়ে দেখেন কোন পক্ষে ধ্বনিভোট বেশি পড়েছে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন। কোনও সাংসদ যদি ব্যক্তিগতভাবে তার ভোট নথিভুক্ত করাতে চান তবে তারও বিধান রয়েছে (যাকে বলা হয় 'ডিভিশন')। তবে সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তার ফলে, খুব অল্প বিল বা প্রস্তাবই 'ডিভিশন' প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। ৫ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে কত সংখ্যক বিলে ভোট নথিভুক্ত বা রেকর্ডেড হয়েছে।

এর অর্থ হল যে নিজেদের সাংসদকে ভোটদানের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করতে পারেন না ভোটাররা। যেসব বিরল ক্ষেত্রে ভোট নথিভুক্ত হয়েছে, সেগুলির গুরুত্বের কথা সহজেই অনুমেয়। ২০১২ সালে দিল্লির গণধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আনা ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল ও জাস্টিস ভার্মা কমিটির রিপোর্ট-এর ওপর 'ডিভিশন' প্রক্রিয়া মেনে ভোটাভুটি হয়েছে। লোকসভায় উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে এই বিলে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটাভুটি নথিভুক্ত হওয়ার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, ওই দিন লোকসভার ৫৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৯৮ জন ভোটাভুটির সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি ব্যবস্থা

সংসদের একদিকে যেমন কাজের চাপ রয়েছে, তেমনই রয়েছে অসংখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার দায়বদ্ধতাও। ৫০০-রও বেশি সদস্যকে নিয়ে গঠিত এই সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সংসদ বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। একেকটি কমিটির সদস্যসংখ্যা মোটামুটি ২০-২৫। বিভিন্ন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে সভার কাছে সুপারিশ পেশ করাই এই সমস্ত কমিটির কাজ। এগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি, বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (DRSCs)। এছাড়া রয়েছে বিশেষাধিকার ও বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি। সংসদের দু'টি সভার দৈনিক কর্মসূচি স্থির করার জন্যও আলাদা কমিটি রয়েছে। রয়েছে সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশন (যেসব বিষয়ে আইন বা বিধি প্রণয়নের জন্য শাসন বিভাগের হাতে আইনসভা ক্ষমতা অর্পণ করে) সংক্রান্ত কমিটি। কমিটি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করে থাকে সেগুলি সভার পূর্ণ অধিবেশন চলাকালীন করাটা মুশকিল। এই কাজগুলি সম্বন্ধে সাংসদদের একটা সম্যক ধারণা থাকা

দরকার। কোনও বিষয় খতিয়ে দেখার সময় কমিটি বাইরের বিশেষজ্ঞ বা অন্যান্য অংশীদারদের পরামর্শ নিতে পারে। তাতে বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব হয়। আর সংসদও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়। সাধারণ মানুষের ওপর একটি বিলের কী প্রভাব পড়তে পারে সংসদের পক্ষে তাও বোঝা সহজ হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা বুঝতেও সাংসদের সাহায্য করে এই সমস্ত কমিটি। একটা বিষয় দেখা গেছে, মাঝে মাঝে দু'-একটা বিরোধী ভোট পড়লেও কমিটিগুলি সাধারণত সর্বসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত নেয় এবং রিপোর্ট পেশ করে।

আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি

আর্থিক বিষয়ে তিনটি কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজকর্ম সম্বন্ধে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল যে রিপোর্ট দেয় সেগুলি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মতামত জানতে চায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (PAC)। সরকারি তহবিলের অর্থ যথার্থভাবে ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা এইভাবেই খতিয়ে দেখে পোস্ট-ফ্যাক্টো অনুমোদন (অর্থাৎ ব্যয় হয়ে যাওয়ার পরে তা খতিয়ে দেখে অনুমোদন দেওয়া) দেয় এই কমিটি। তারপরে এই কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে এই একই ভূমিকা পালন করে থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বিষয়ক কমিটি (CoPU)। অগ্রাধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখে এস্টিমেটস কমিটি।

বিরোধী পক্ষের কোনও বরিষ্ঠ নেতাকে PAC-এর সভাপতি মনোনীত করা হয়। ষোড়শ লোকসভার সময়কালে (২০১৪-'১৯) ৯৫৭-টি অনুমোদন-সহ মোট ১৩৭-টি রিপোর্ট পেশ করেছে এই কমিটি। এর ৮০ শতাংশই মেনে নিয়েছে সরকার।

বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

এই ধরনের ২৪-টি কমিটি গঠন করেছে সংসদ। এই কমিটিগুলি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে। যেসমস্ত বিল এই কমিটিগুলির কাছে পাঠানো হয়

চিত্র-৬
সাম্প্রতিককালে খুব অল্পসংখ্যক বিলই বিভিন্ন কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে

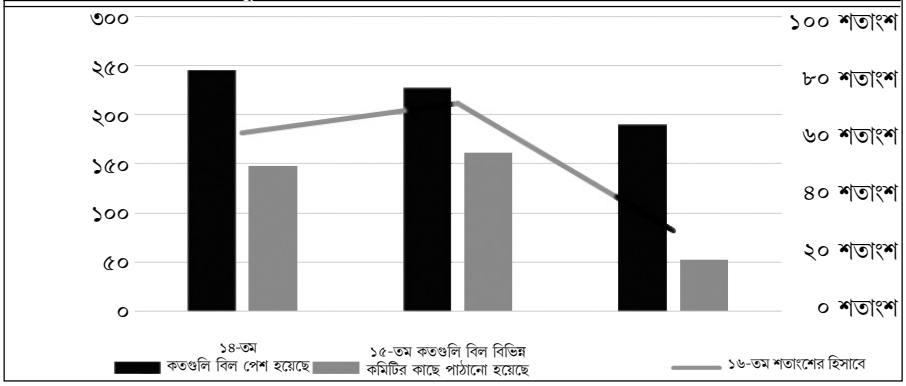

সেগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবিও পেশ করে এই সমস্ত কমিটি। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের এক্তিয়ারে যেসমস্ত বিষয় পড়ে সেগুলিও খতিয়ে দেখতে পারে (যেমন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুক্ত স্থায়ী কমিটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী বা CRPF-এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে পারে) এই কমিটিগুলি। কমিটিগুলির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে করা সুপারিশগুলি সম্পর্কে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

সব বিল এই কমিটিগুলির কাছে পাঠানোটা বাধ্যতামূলক নয় (ব্রিটেনের পার্লামেন্টে কিন্তু অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে কমিটির পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক)। কোন কোন বিল স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হবে সরকারের সঙ্গে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন লোকসভার স্পিকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। সাম্প্রতিককালে স্থায়ী কমিটিগুলির কাছে পাঠানো বিলের সংখ্যা অনেক কমে গেছে (চিত্র-৬ দ্রষ্টব্য)।

সাবঅর্ডিনেট আইন সংক্রান্ত কমিটি

সংসদ যখন কোনও বিল পাস করে সেটিকে আইনের রূপ দেয় তখন বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে সেই আইনের খুঁটিনাটি প্রনিয়ম স্থির করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়। যেমন, RBI আইন স্ট্যাটিউটারি লিকুইডিটি রেশিও স্থির করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে। সেইসঙ্গে অবশ্য এই রেশিওর সর্বোচ্চ সীমাও বেঁধে দিয়েছে এই আইন। সরকার প্রণীত এই সমস্ত বিধি বা প্রনিয়ম আইনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাও খতিয়ে দেখে এই কমিটি।

সংসদীয় কমিটিগুলির কাজকর্ম আরও দক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কমিটির কর্মীদের সাহায্য করার জন্য কোনও গবেষণা বিশেষজ্ঞ নেই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিলই এই কমিটিগুলির কাছে পাঠানো হয় না এবং এই ঘটনা প্রয়শই ঘটছে। এই সংসদীয় কমিটিগুলির কাছে সমস্ত বিল পাঠানোটা বাধ্যতামূলক করার জন্য সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে

ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংসদ। সংসদ নাগরিকদের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সত্তর বছর ধরে ভারতের সংসদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশটির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করেছে সংসদ। সংসদ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তবে সংসদের কাজকর্ম আরও দক্ষ করে তোলার এখনও অনেক অবকাশ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ভোটের নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, সর্বোপরি কমিটি ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) বার্ক এডমান্ড, স্পিচ টু দ্য ইলেক্টর্স অফ ব্রিস্টল, ১৭৭৪

(২) কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ডিবেটস, সপ্তম খণ্ড, ৪ নভেম্বর, ১৯৪৮

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

গণপরিষদ এবং সংবিধান রচনা

গণপরিষদ বা সংবিধান সভা (১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসারে গঠিত) ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে ভারতের সংবিধানের খসড়া রচনা করে। এই গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ২৯৯ সদস্যবিশিষ্ট (তার মধ্যে মহিলা সদস্য ছিলেন ১৫ জন) গণপরিষদ তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে (১৯৪৬-'৪৯) সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের সদস্যরা ১১-টি অধিবেশনে মিলিত হন।

"শ্রদ্ধেয় বাবা সাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে একটি সামুদয়িক সংবিধান রচনা করে ভারত। নতুন ভারত গঠনের অঙ্গীকার পূরণের পথিকৃৎ এই সংবিধান। সংবিধান আমাদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং সেইসঙ্গে কিছু সীমারেখাও বেঁধে দিয়েছে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট ড. বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে গণপরিষদ একটি খসড়া কমিটি গঠন করে।

"সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনি নথি নয়। তা জীবনের পাথেয় এবং যুগের আদর্শ প্রতিফলনের মাধ্যম।"

ড. বি. আর. আম্বেদকর

ড. বি. আর. আম্বেদকর

ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়। ওই সময় থেকেই গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়ে ভারতের অস্থায়ী সংসদ বা পার্লামেন্টে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালে দেশের নতুন সংসদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী সংসদ কাজ চালিয়ে যায়। খসড়া সংবিধান নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলাকালীন পেশ হয় মোট ৭,৬৩৫-টি সংশোধনী প্রস্তাব। এর মধ্যে ২,৪৭৩-টি সংশোধনী নিয়ে বিচারবিবেচনা করে সেগুলির নিষ্পত্তি করা হয়।

সভার ২৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮৪ জন সংবিধানে স্বাক্ষর করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা ভারতের সংবিধানে স্বাক্ষর করছেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর, ড. জন মাথাই এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

সংবিধান রচনার বিভিন্ন দিক তত্ত্বাবধানের জন্য গণপরিষদ মোট ১৩-টি কমিটি নিয়োগ করে। এর মধ্যে প্রধান কমিটি আটটি। আর বাকি কমিটিগুলি ছোটোখাটো বিভিন্ন কাজের জন্য (মাইনর)। এই আটটি প্রধান কমিটি হল :

- খসড়া কমিটি (ড্রাফটিং কমিটি)
- কেন্দ্রের ক্ষমতা বিষয়ক কমিটি (ইউনিয়ন পাওয়ার কমিটি)
- ইউনিয়নের গঠন সংক্রান্ত কমিটি (ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটি)
- প্রদেশগুলির গঠন সংক্রান্ত কমিটি (প্রভিন্সিয়াল কনস্টিটিউশন কমিটি)
- মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতি অধ্যুষিত ও বহির্ভূত এলাকা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি (অ্যাডভাইসরি কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল রাইটস, মাইনরিটিজ, ট্রাইবাল অ্যান্ড এক্সক্লুডেড এরিয়া)
- অনুশাসন কমিটি (রুলস অফ প্রসিডিওর কমিটি)
- রাজ্য কমিটি (স্টেটস কমিটি)
- পরিচালক কমিটি (স্টিয়ারিং কমিটি)

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের চূড়ান্ত অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

গণপরিষদ ও পরিষদের উল্লেখযোগ্য সদস্যগণ

ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ ক্রমে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছিল। এই পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন :

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
জওহরলাল নেহরু
ড. বি. আর. আম্বেদকর
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
সরোজিনী নাইডু
রাজকুমারী অমৃত কাউর
জে. বি. কৃপালনী
সি. রাজাগোপালাচারী
শরৎচন্দ্র বসু
আসফ আলি
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হানসা মেহতা
গোপীনাথ বরদোলই
হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি
বিনোদানন্দ ঝা
দুর্গাবাই দেশমুখ
ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্তনি
জয়পাল সিং মুণ্ডা
হরগোবিন্দ পন্ত
জন মাথাই
বেগম আইয়াজ রসুল
কে. এম. মুন্সি
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
আম্মু স্বামীনাধন
এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার
আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার
বি. পট্টভি সীতারামাইয়া
টি. প্রকাশম
এন. সঞ্জীব রেড্ডি
এস. নিজলিঙ্গাপ্পা
জি. ভি. মভলংকার
পদমপৎ সিংহানিয়া
পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন
সুচেতা কৃপালানী
হসরত মোহানি
রফি আহমেদ কিদোয়াই
অনুগ্রহনারায়ণন সিনহা
জগজীবন রাম
সচ্চিদানন্দ সিনহা
সত্যনারায়ণ সিনহা
শ্রী কৃষ্ণ সিনহা
শেঠ গোবিন্দ দাস
হরি সিং গৌর
পাঞ্জাবরাও এস. দেশমুখ
রবিশংকর শুক্লা
হরেকৃষ্ণ মহতাব
অ্যানি মাস্কারেনে
জীভরাজ নারায়ণ মেহতা
মতুরি সত্যনারায়ণ
দীপ নারায়ণ সিং
স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা
কে. কামরাজ
পি. সুব্বারায়ণ

সূত্র : www.doj.gov.in

গণপরিষদ ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই জাতীয় পতাকা গ্রহণ করে এবং ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীত গ্রহণ করে।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রী নন্দলাল বসু সংবিধানের প্রতিটি পাতার অলংকরণ করেন।

হস্তলিপি বিশারদ শ্রী প্রেম বিহারী নারায়ণ রাইজাদা সংবিধানটিকে লিপিবদ্ধ করে। এই কাজে তার সময় লেগেছিল ছ'-মাস। এই কাজের জন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিকও নেননি।

মৌলিক কর্তব্যসমূহ : তাৎপর্য ও সংযোজন

"মায়ের কোল থেকেই আমি আমার কর্তব্য শিখেছি। তিনি গ্রামের নিরক্ষর মহিলা...কিন্তু তিনি আমার ধর্ম জানতেন। আমরা যদি বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা পাই যে আমাদের ধর্ম কী এবং সেগুলি লালন করতে হবে তথা অনুসরণ করতে হবে...তাহলে কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়েই আমরা নিজেদের অধিকার পেতে পারি এবং এটাই আমাদের ধর্মের সৌন্দর্য। কর্তব্য ছাড়া অধিকার পাওয়া যায় না। এইভাবেই সত্যাগ্রহের জন্ম। আমার কর্তব্য কী? এটাই আমি প্রতিনিয়ত জানার চেষ্টা করেছিলাম।"

(১৯৪৭ সালের ২৮ জুন দিল্লিতে এক প্রার্থনা সভায় মৌলিক কর্তব্যের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য।)

নাগরিকরা সংবিধানে প্রদত্ত যে সর্বাত্মক অধিকার ভোগ করেন তার বিনিময়ে যে কিছু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায় সেবিষয়টিকে তুলে ধরার জন্যই ১১-টি মৌলিক কর্তব্য সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সম্মান প্রদান, শ্লাঘাবোধ, সহিষ্ণুতা, শান্তি, উন্নয়ন ও ঐক্য—এই মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরতেই মৌলিক কর্তব্যের অবতারণা।

১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত এই অংশে দেশের নাগরিকদের মৌলিক, নৈতিক ও বাধ্যতামূলক কর্তব্যের কথা বলা হয়।

সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্তির সুপারিশের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির মতে, নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার সময় নাগরিকরা যাতে নিজেদের মৌলিক কর্তব্যের কথা বিস্মৃত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২০০২ সালে ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে একাদশ-তম মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে যোগ করা হয়।

পূর্বতম সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও চিনের সংবিধান থেকে মৌলিক কর্তব্যের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকেই মৌলিক কর্তব্য হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। জনজীবনে শৃঙ্খলা আনা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রসারেই মৌলিক কর্তব্যগুলির অবতারণা।

সংবিধানে যেমন নাগরিকদের বিশেষ কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভোগ করতে গেলে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ পালন করাও যে প্রয়োজন মৌলিক কর্তব্যসমূহ সেকথাই তাদের মনে করিয়ে দেয়। কারণ অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

"গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকারের একটা রূপ নয়...আমাদের সহনাগরিকবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোরও একটা মাধ্যম।"

ড. বি. আর. আম্বেদকর

"তারা রাজপুত, জাঠ, কি শিখ প্রত্যেক ভারতবাসীকে এখন তা ভুলে যেতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি সবার আগে একজন ভারতবাসী। এই দেশে তার প্রতিটি অধিকার আছে, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু কর্তব্য রয়েছে।"

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

মৌলিক কর্তব্যগুলি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যগুলি পূরণে সাহায্য করে।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে বিচারপতি ভার্মার নেতৃত্বাধীন এক কমিটি 'দেশের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য পরামর্শ' দিতে এক প্রতিবেদন পেশ করে।

সংবিধানের ৪-এ অধ্যায়ের ৫১এ ধারায় উল্লিখিত এগারোটি মৌলিক কর্তব্য

মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৯(১) ধারার আদর্শ অনুসরণ করেই সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলির সংযোজন করা হয়েছে।

"বাঁচার অধিকার আমরা তখনই পাব যখন বিশ্বনাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করবে। এই মৌলিক বিবৃতির মাধ্যমেই নারী-পুরুষের কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে ধারণা করা যায় এবং প্রতিটি অধিকার পাওয়ার জন্য আগে যে সেসম্পর্কিত কিছু কর্তব্য পালন করতে হয় তাও বোঝা যায়। বাকি সব অধিকারকে বলা যায় জবরদখল যার জন্য লড়াই করার কোনও মানেই হয় না।"

মহাত্মা গান্ধী

মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য একই মুদ্রা দু'টি পিঠ :

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "কর্তব্যের উৎসটা একদম যথাযথ। আমরা যদি আমাদের কর্তব্য পালন করি তাহলে অধিকার আপনা থেকেই আসবে।"

নাগরিকরা যদি মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যগুলিকে পরস্পরের পরিপূরক করে তুলতে না পারে তাহলে সমাজে গণতন্ত্রের শিকড় বিস্তারলাভ করতে পারবে না।

প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য জড়িত। একজন নাগরিক তার কর্তব্য পালন করলে বাকিদের অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

আমরা আমাদের কর্তব্যগুলি পালন করলে তবেই অধিকার ভোগ করতে পারব।

সূত্র : www.doj.gov.in

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা

ড. এম. আর. শ্রীনিবাস মূর্তি
সুরভি সিং

সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন যাবৎ ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কাজকর্ম করা সুবাদে গান্ধীজী এসংক্রান্ত বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। সেকারণে তিনি সবসময়ই কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা ও গ্রামস্তর—এই চার ধরনের প্রশাসনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণায় গণতন্ত্রের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে গ্রামকে তুলে ধরা ছিল অন্যতম প্রধান। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তর থেকে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নীতিতে, অর্থাৎ গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় স্তর, আস্থা ছিল তাঁর।

গণপরিষদ এবং পঞ্চায়েতি রাজ

গণপরিষদ দ্বিস্তরীয় প্রশাসনের কথা বলেছিল। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে পরিষদের সামনে ভারতের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ হওয়ার সময় গ্রামীণ প্রশাসন সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলা হয়নি।

ড. বি. আর. আম্বেদকর প্রাদেশিক স্তর সম্বন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। গণপরিষদের একটি বৈঠকে তিনি বলেন গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রে জাতপাত এবং স্থানীয় বিষয়গুলি বড়ো বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গ্রাম সমাজের সংস্কার করে তৃণমূল স্তরে সামাজিক উন্নয়নের কাজে অনেকটা সময় দেওয়া দরকার বলে তিনি মনে করতেন। স্বাধীনতার সময় ভারতের পরিসম্পদ মূলত ব্যবহৃত হ'ত বিশ্বের আঙিনায় দেশকে তুলে ধরা এবং দেশের ভিতরে খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সংস্থানে। গ্রামীণ সংস্কার তখনও ততটা গুরুত্ব পায়নি।

সংবিধান (৭৩-তম সংশোধনী), ১৯৯৩

দেশ স্বাধীন হওয়া এবং সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫২ সালে সূচনা হয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীগত উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচির (Community Development Projects)। এক্ষেত্রে নিদর্শ হিসেবে সামনে রাখা হয়েছিল শান্তিনিকেতন, ভদোদরা এবং নিলোখেরি-কে। ১৯৫৭ সালে গঠিত হয় বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে, স্থানীয় ও জনগোষ্ঠীগত উন্নয়নের কাজে নেতৃত্বে থাকা উচিত বিধিবদ্ধ কোনও সংস্থার; যেমন গ্রামস্তরে কোনও সংস্থা, যা সেখানকার গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব করবে এবং দায়িত্ব নিয়ে সরকারের বিকাশমূলক কর্মসূচির রূপায়ণে কাজ করবে।

জাতীয় বিকাশ পরিষদ (National Development Council) গঠিত হয় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে ভিত্তি করে। এই পরিষদই গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় 'পঞ্চায়েতি রাজ' শব্দটিকে বহুল

[শ্রী মূর্তি রাঁচির National University of Study and Research in Law-এর সহযোগী অধ্যাপক। ই-মেল : meenigam@gmail.com
শ্রী সিং ওই একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ সহায়ক। ই-মেল : ssingh2151987@gmail.com]

প্রচারিত করে তোলে। দেশে প্রথম ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৯৫৯ সালের ২ অক্টোবর রাজস্থানের নাগাউরে।

'পঞ্চায়েতি রাজ'-এর ধারণাকে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ দেয় জয়প্রকাশ নারায়ণ কমিটি। ১৯৭১ সালে স্থানীয় গোষ্ঠীগত উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Community Development)-কে মিলিয়ে দেওয়া হয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের সঙ্গে। তখন থেকে 'স্থানীয় গোষ্ঠীগত উন্নয়ন' (Community Development)-এর বদলে 'গ্রামোন্নয়ন' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।

১৯৭৮ সালে অশোক মেহতা কমিটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'পঞ্চায়েতি রাজ'-কে বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সুপারিশ করে। কমিটির অভিমত অনুযায়ী, স্থানীয় স্তরের সংস্থাগুলির হাতে আরও ক্ষমতা ও অর্থ দেওয়ার কাজ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্য। এর আগে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রামীণ সংস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত সরাসরি নির্বাচন করানোর কথা বলা হয় এবং রাজ্যের হাত থেকে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও সরিয়ে নেওয়া হয়। কর এবং অন্য কিছু খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয় তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক সংস্থার হাতে।

৬৪-তম সংশোধনী বিল

এই বিল পেশের সময় বলা হয়েছিল যে পঞ্চায়েতি রাজ গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এবং মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কাজ করার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সিলমোহর আবশ্যিক। এরপর আসে ৬৫-তম সংশোধনী বিল। সেখানে নগরাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনকেও পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার মতো দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। দু'টি বিলই সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তবে কোনওটিই সংশোধিত আইন হতে পারেনি।

সংবিধান (৭৩-তম সংশোধনী) আইন, ১৯৯৩

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা এবং গ্রামোন্নয়নের বিষয়টিকে কখনই অবহেলা করেনি ভারত। কিন্তু, উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের প্রথম ৫০ বছরে জাতীয় স্তরের উন্নয়নকেই মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৯২-'৯৩ সালে আনা হয় ৭৩-তম এবং ৭৪-তম সংবিধান সংশোধনী, যা স্থানীয় স্বপ্রশাসনকে সরকারের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭৩-তম সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পঞ্চায়েতি রাজকে চিহ্নিত করা এবং তাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্দেশিকার চল্লিশ নম্বর ধারা বলছে, 'গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাংগঠনিক স্থাপনা এবং তারা যাতে স্বপ্রশাসনের একক হিসেবে কাজ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করবে রাষ্ট্র।' পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বিষয়টির মধ্যে ধারা-বাহিকতা এবং স্থায়িত্ব নিয়ে আসার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংবিধানের নবম বিভাগ।

৭৩-তম সংশোধনী, ১৯৯৩-এর লক্ষ্য

এই সংশোধনীতে পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচন, জনসংখ্যা অনুযায়ী তপশিলি জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য আসন সংরক্ষণ, মহিলাদের জন্য অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ, পঞ্চায়েত প্রধানের দপ্তর, ৫ বছরের মেয়াদকাল, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন, বিধি পালনে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত প্রতিনিধির সদস্যপদ খারিজ,

পঞ্চায়েতের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার সংস্থান, রাজস্ব সংগ্রহ, কর আদায় প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৩-তম সংশোধনীর পরবর্তীতে

৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর পর রাজস্থানের নাগাউর জেলা এবং তার পরে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচন হয়।

সাংবিধানিক কাঠামোয় পঞ্চায়েতি রাজ-এর অন্তর্ভুক্তির পর সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষজনকে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ২.৪ লক্ষ পঞ্চায়েতে ২৮ লক্ষ জনপ্রতিনিধি কাজ শুরু করেন। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ মহিলা, ১৯ শতাংশ তপশিলি জাতি, ১২ শতাংশ তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যা অনুযায়ী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তরাও নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রতিনিধিত্বে এসেছেন।

ডিজিটাইজেশন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে এসেছে। আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য অমবাডসম্যান, সোশ্যাল অডিট-এর ব্যবস্থা আছে। চালু করা হয়েছে কাজকর্মের মূল্যায়ন কর্মসূচিও।

মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে (MGNREGN)-র রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতগুলিকে।

অনগ্রসর অঞ্চল মঞ্জুরি তহবিল (Backward Region Grant Fund—BRGF)-এর সূচনা হয়েছে পঞ্চায়েতগুলির জরুরি আর্থিক সংস্থানে। এর ফলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এগোনো গেছে অনেকখানি। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে পঞ্চায়েতগুলি আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারছে।

পঞ্চায়েতগুলির সামনে বিভাজ্য কর তহবিলের (Divisible Tax Pool) অংশবিশেষ ব্যবহার করার সুযোগ এনে দিয়ে তাদের প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ হওয়ার পথে আরও এগিয়ে দিয়েছে ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন।

এগিয়ে চলা

১৯৯৩-এর পর পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে অনেকখানি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের 'পূর্ণ স্বরাজ'-এ পৌঁছতে পাড়ি দিতে হবে আরও অনেকটা পথ।

চাই আরও কর্মী, প্রশস্ত দপ্তর এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। দরকার পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের। রাজ্যগুলিকে বাধ্য করতে হবে পঞ্চায়েতগুলির হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আরও ব্যাপকভাবে প্রদানে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে চাই জোরদার উদ্যোগ। রাজ্য অর্থ কমিশনের যথাযথ কাজকর্ম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং ষষ্ঠ তফশিলের আওতাধীন এলাকাগুলির দিকে দিতে হবে আরও নজর। আরও কার্যকর করে তুলতে হবে গ্রামসভাগুলিকে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

সর্বজনীন স্বাস্থ্য

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা

এস. এন. ত্রিপাঠী
সি. শীলা রেড্ডি

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গকে ক্ষমতা অর্পণ করাই শুধুমাত্র সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নয়, সেইসব ক্ষমতায় লাগাম টেনে রাখাও এর অন্যতম লক্ষ্য। সংবিধানবাদ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের কথা ভেবেছে এবং আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতায় বেড়ি পরিয়েছে। রাষ্ট্রের কোনও অঙ্গই অযৌক্তিকভাবে নিজের ক্ষমতা দাবি করবে না, এটাই হল সংবিধানের আদত সত্তা। সংবিধানে বেঁধে দেওয়া ক্ষমতার বাইরে পা বাড়ানো চলবে না।

যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান চায় সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও ক্ষমতা ঠিক করে সরকারের বুনিয়াদি অঙ্গগুলি গড়ে তুলতে। এই অঙ্গ বা সংগঠনগুলিকে মানুষের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ করাই এর লক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য, অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার রোখা এবং যাচাইয়ের ব্যবস্থা (Internal checks and blances) ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে এই দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা হয়। সরকারকে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ থেকে আটকানোর জন্য, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং রীতির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য থাকা দরকার। লর্ড অ্যাক্টন-এর কথা, ‘‘ক্ষমতা দুর্নীতির আধার এবং অবাধ বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ঝোঁক থাকে চরম দুর্নীতির দিকে।’’ অ্যারিস্টটলের জোরালো বিশ্বাস ছিল যে, লাগামছাড়া কর্তৃত্ব নয়, সৎ ও দক্ষ সরকারকে অবশ্যই সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখতে, ফরাসি মনীষী মন্টেসকিএউ প্রচারিত ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানের মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ মানেই ক্ষমতার সাম্য নয়, কিন্তু তা অবশ্যই একে অন্যের রাশ টেনে রাখে।

সংবিধানের প্রাণসত্তা

সাধারণভাবে, শাসন তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত : আইনসভা বা ব্যবস্থাপক সভা (আইন তৈরি), প্রশাসন (আইন বলবৎ বা কার্যকর করা) এবং বিচার বিভাগ বা আইন প্রণয়ন, বলবৎ এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত বিবাদের ফয়সালা। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গকে ক্ষমতা অর্পণ করাই শুধুমাত্র সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নয়, সেইসব ক্ষমতায় লাগাম টেনে রাখাও এর অন্যতম লক্ষ্য। সংবিধানবাদ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের কথা ভেবেছে এবং আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতায় বেড়ি পরিয়েছে। রাষ্ট্রের কোনও অঙ্গই অযৌক্তিকভাবে নিজের ক্ষমতা দাবি করবে না, এটাই হল সংবিধানের আদত সত্তা। সংবিধানে বেঁধে দেওয়া ক্ষমতার

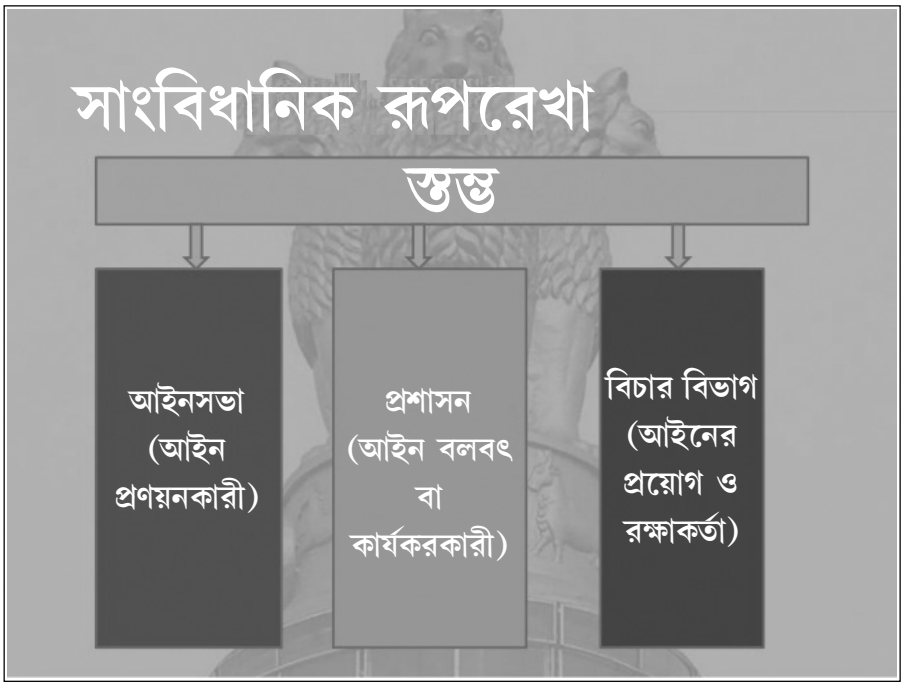

[শ্রী ত্রিপাঠী, অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, দিল্লি। ই-মেল : sntripathi@gmail.com। শীলা রেড্ডি, ওই একই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। ই-মেল : sheelachavva@gmail.com]

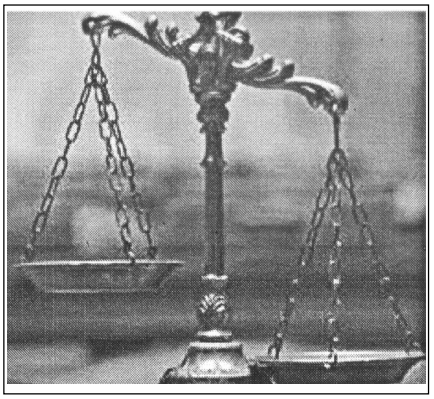

বাইরে পা বাড়ানো চলবে না। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে. জি. বালাকৃষ্ণণের মন্তব্য, ''সংবিধান বিচার বিভাগ-সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সীমা পরিসর, ভূমিকা এবং কাজকর্ম ও তাদের কাঠামো ঠিক করে দেয় এবং অঙ্গগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের রীতিনীতি গড়ে তোলে।''

ভারতীয় সংবিধান ক্ষমতা পৃথকীকরণের তৃতীয় এবং স্বতন্ত্র এক মডেল বা নমুনা তুলে ধরেছে। অন্য দুই মডেল হল, মার্কিন ও ব্রিটেনের (ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচ) সংবিধান। আমেরিকার সংবিধানে বিচার বিভাগকে এক অনন্য স্থান দিয়ে রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনে এক শক্তপোক্ত দেওয়াল খাড়া করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনের সংবিধান আইনসভার সর্বময় কর্তৃত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে ঢিলেঢালা ক্ষমতা বণ্টনে বিশ্বাসী। ভারতে, সংবিধানই হচ্ছে একচ্ছত্র বা সার্বভৌম এবং কোনও কিছু সংবিধানের বেঁধে দেওয়া লক্ষণরেখা ডিঙোলে তা অবধারিতভাবে বাতিল ও অসাংবিধানিক বলে গণ্য করা হবে। সরকারের অঙ্গগুলি সচেতন যে তাদের ক্ষমতা নিঃশর্ত এবং চিরকেলে বা পাকাপাকি নয়।

কাজকর্ম ডিঙানো : আইনসভা ও প্রশাসন

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার নয়, ভারত অবলম্বন করেছিল সংসদীয় ধাঁচের সরকার। তবে, ভারতের আইনসভা ব্রিটেনের মতো সর্বময় বা চরম কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। ব্রিটেনের পার্লামেন্টকে সংবিধান সংশোধন, রদবদল বা বাতিল করার বিস্তর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতে কিন্তু বিধিবদ্ধ এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে ফারাক আছে। ৩৬৮ ধারা অনুসারে সংশোধন করার জন্য সংবিধানে ঢোকানো হয়েছে বিশেষ বিধান। তবে, *কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য* (১৯৭৩) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, কোনও সংশোধন সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যে ঘুণ ধরালে তা অসাংবিধানিক বলে বাতিল করা হবে। ভারতে, আইনসভা তার ক্ষমতা পায় সংবিধান থেকে এবং সংবিধান লঙ্ঘন করার কোনও অবাধ বা যথেচ্ছ এক্তিয়ার আইনসভার নেই।

ভারতীয় সংবিধান চোখ-কান বুঁজে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করে না। প্রশাসন হচ্ছে আইনসভার অংশ এবং তার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। স্বাভাবিকভাবে, যাবতীয় আইনকানুনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের সম্মতি দরকার। আইনসভার দুই কক্ষের অধিবেশন না চলার কালে, রাষ্ট্রপতি (১২৩ ধারা) বা রাজ্যপাল (২১৩ ধারা)-এর অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারির ক্ষমতা আছে। আইনসভা প্রণীত আইনের সমান স্টেটাস এই অধ্যাদেশেরও। আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এড়ানোর এক হাতিয়ার হিসেবে অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে প্রশাসনের তরফে শাসন চালানোর পথ ধরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩১১ ধারা কেন্দ্র বা রাজ্যে কোনও সরকারি পদাধিকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনকে তদন্ত করা এবং সাজা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তবে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমতা আছে দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা বা তার সাজা মকুব করার। আইনসভা বিচারের কাজও করে, কেননা সদস্য বা বাইরের কোনও ব্যক্তিকে পার্লামেন্ট তার বিশেষ অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার দায়ে তিরস্কার করতে বা দণ্ডাদেশ দিতে পারে (সদস্যদের বেলায় আপাত বহিষ্কার বা সাসপেনসন অথবা বহিষ্কারও)। কিছু কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মের বেলায়, প্রশাসন আইনসভার উপর নির্ভরশীল। প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মায় তাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাধর আইনসভা সভাকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো কিছু প্রশাসনিক কাজকর্মও করে।

৪২-তম সংশোধন (১৯৭৬) ৩২৩ক এবং ৩২৩খ ধারা প্রবর্তন করে। এই সংশোধনী মারফত সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিকে ট্রাইব্যুনাল গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিচারের ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই। ধারা দু'টি ৩২ এবং ২২৬ ধারার আওতায় আদালতের পর্যালোচনার ক্ষমতা পুরোপুরি রদ করে দিয়েছে এবং সেই ক্ষমতা আইনগতভাবে ট্রাইব্যুনালের হাতে ন্যস্ত করেছে। সংসদের অধিকার আছে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা, এক্তিয়ার, গঠনতন্ত্র এবং সংগঠন সংক্রান্ত আইন তৈরির। বিচারপতিদের ইমপিচমেন্টের ক্ষমতা সাংসদের হাতে। এই ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির ফল কী দাঁড়াবে তা শেষপর্যন্ত নির্ভর করে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের উপর। ভারতীয় সংবিধানে কাজকর্মের সীমা ডিঙানোর বর্তমান রীতিনীতিতে প্রশাসনকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপেরও অনুমতি দেওয়া আছে। সংবিধান মোতাবেক, রাষ্ট্রপতি ঠিক করবেন হাইকোর্টে বিচারপতিদের সংখ্যা এবং সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে কারা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হবেন। সম্ভবত, সংবিধান অনুসারে সবচেয়ে অস্বাভাবিক ধরনের আইন তৈরির ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার এক তালিকা আছে জরুরি বিধানের আওতায় (৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ ধারা)।

বিচার বিভাগের ভূমিকা

পক্ষপাতহীনতার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সাংবিধানিক বিধিবিধান এবং আইনের শাসনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির প্রেক্ষিতে, বিচার বিভাগ তার বিচার সংক্রান্ত পর্যালোচনা করার ক্ষমতায় আইনসভা এবং প্রশাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি খতিয়ে দেখে। এই একচেটে কর্তৃত্বের কর্তৃত্ব বিচার বিভাগের ঘাড়ে আরও বেশি সতর্ক হওয়ার বাড়তি বোঝা চাপিয়েছে বিচার সংক্রান্ত পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সময়। বিচার বিভাগকে ক্ষমতা

বিভাজনের ঘোষিত নীতি মেনে চলতে হবে। এই নীতি ভাঙ্গা চলবে না।

আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করতে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগের পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ মাঝে মাঝে গণতন্ত্রের তিন স্তম্ভের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগায়। তবে, সংসদ প্রণীত আইনের সাংবিধানিক বৈধতার বিষয়ে বিচারকালে সংবিধান কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট মারফত। আইন বা আইনসভা অথবা প্রশাসনের অন্য কোনও সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত বা অবৈধ হওয়ার সিলমোহর লাগায় আদালতের রায়। সংবিধানের ৩২ ধারা আদালতকে প্রসঙ্গনীয় মৌলিক অধিকারের অভিভাবক বানিয়েছে। নাগরিকের এসব অধিকার সুরক্ষার জন্য আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারে। এমনকি, শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার কেন, অন্যান্য আইনি অধিকার সুরক্ষার বেলাতেও হাইকোর্ট ২২৬ ধারার আওতায় এই ক্ষমতা ভোগ করে। ১৪১ ধারা অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের ঘোষিত আইন ভারতের সব আদালত মানতে বাধ্য। ১৪২ ধারার আওতায় শীর্ষ আদালত তার কাছে দাখিল করা যেকোনও বিষয়ে পুরোদস্তুর ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ডিক্রি বা আদেশ জারি করতে পারে এবং ১৪৪ ধারা মোতাবেক প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় যাবতীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সাহায্য করতে কাজ করবে। এই তিনটি ধারা সুপ্রিম কোর্টকে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান করেছে। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বদলানো যাবে না, ধারা তিনটি সংসদের উপর এই বাধানিষেধ চাপিয়েছে। শীর্ষ আদালতের নয় বিচারপতির এক সংবিধান বেঞ্চ আদেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিচারালয় খতিয়ে দেখতে পারে। এই রায়ের পক্ষে মত দিয়েছিলেন বেঞ্চের ছয় সদস্য। সুপ্রিম কোর্ট এমন নির্দেশও দিয়েছে যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়া অপরাধীকে ক্ষমার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত আদালতে পর্যালোচনা করে দেখা যাবে।

নির্দিষ্ট মামলা ও ব্যাখ্যা

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি নিয়ে মোটামুটি ঐক্যমত্য থাকলেও, বস্তুত মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ সংবিধানে তার জন্য বেঁধে দেওয়া সীমা ছাড়িয়েছে কি না সে ব্যাপারে বিতর্ক দানা বাঁধে। এর এক নজির হচ্ছে ১৯৭৩ সালে *কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য* মামলা। এই মকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান সংশোধনে আইনসভার ক্ষমতা বিবেচনা করে দেখেছিল। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে সংবিধানের ''মৌলিক কাঠামো'' ভারতীয় সংবিধানের এক অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য, যা কিনা মায় সংসদের কোনও আইনও বদলাতে পারে না। ১৯৭৫ সালে অবশ্য আদালতের এই বক্তব্যকে তখনকার সরকার সুপ্রিম কোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করে। *ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজ নারায়ণ* মামলাটির উল্লেখ করা এখানে প্রাসঙ্গিক। নানা কারণে এই মকদ্দমার রায় গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন ইলাহাবাদ হাইকোর্ট এই বলে বাতিল করেছিল যে তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮ক ধারায় উল্লেখ করা অসাধু উপায় ব্যবহার করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী এই রায়ের বিরুদ্ধে আর্জি জানান সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালত কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে। আবেদনের ফয়সালা হওয়ার আগে, সংসদে সংবিধান (৩৯-তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ পাস হয়ে যায়। এই সংশোধনী আইনে বলা হয়েছিল, সংসদের যেকোনও কক্ষের কোনও ব্যক্তি এধরনের ভোটের সময়

প্রধানমন্ত্রী পদে থাকলে বা এহেন ভোটের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলে তার নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। তবে সংসদের তৈরি আইনের দ্বারা বা আওতায় তেমন কোনও ধরনের ব্যবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, সংসদ হচ্ছে সর্বেসর্বা এবং মানুষের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী। তাই, জনগণের প্রতিনিধিরা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে এবং বিচার বিভাগীয় বৈধতা বিচারের পরিসীমা বেঁধে দিতে কোনও বিশেষ নিয়ম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলে, আদালতের কোনও অধিকার নেই তা সাংবিধানিক কিনা এনিয়ে প্রশ্ন তোলার। অবশ্য, সুপ্রিম কোর্ট মত দিয়েছিল যে, ওই সংশোধনীর ধারাগুলি সংবিধানের ''মৌলিক কাঠামো'' লঙ্ঘন করেছে। এই মতের পিছনে মূল যুক্তি হচ্ছে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কিত বিতর্কে আইনসভা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং একাজ নিরপেক্ষভাবে করবে কোনও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। সংবিধান সংশোধন হল আইনসভার এক হাতিয়ার এবং আইনসভা কোনও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তা আইনসভার এক্তিয়ার বহির্ভূত। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে, সেই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন খারিজ হয়, 'মৌলিক কাঠামো'-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে এক সাংবিধানিক সংশোধন বাতিল হয়ে যায় এবং প্রধানমন্ত্রীর বরবাদ হয়ে যাওয়া নির্বাচন বৈধ করতে নির্বাচন আইন সংশোধিত হয়। কৌঁসুলি ননী পালকিওয়ালার জোরালো সওয়াল মেনে, ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ''মৌলিক কাঠামো''-এর তত্ত্বে সমর্থন জানান এবং তত্ত্বটি আমাদের সংবিধানের অবিচ্ছিন্ন এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ফের ঘোষিত হয়।

৯৯-তম সংবিধান সংশোধন আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ন্যাশনাল জুডিশাল অ্যাপয়ন্টমেন্টস কমিশন (NJAC)-এর সেগুলি সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা আরও এক জলজ্যান্ত নজির যখন কোনও সংসদীয় আইন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নীতি মেনে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতি (নির্যাতন নিবারণ) আইন ১৯৮৯ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় এবং ওই আইনে ১৮ক ধারা জুড়তে সংসদের জনমোহিনী প্রতিক্রিয়া বা সাড়া কার্যত সুপ্রিম কোর্টের হুকুম পাশ কাটানোর শামিল। এসব বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পক্ষে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং সংবিধান বিশারদদের কাছে উদ্বেগের বিষয়।

আদালতের তৎপরতা বনাম অতি সক্রিয়তা

আইন তৈরির ক্ষেত্রে আইনসভার বা শাসন পরিচালনার ব্যাপারে প্রশাসনের ফাঁকফোঁকর অথবা ত্রুটিবিচ্যুতি বিচার বিভাগ শুধরে দেবে বলে আশা করা হয়। আদালতকে মানুষ তৎপর করে তুলতে পারে (জনস্বার্থ মামলা মারফত) বা বিচারালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গরজ দেখাতে পারে। অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার পরিস্থিতিতে আদালতের সাড়া দেওয়াই হচ্ছে বিচার বিভাগের সক্রিয়তা। এই ইতিবাচক ধারণার লক্ষণ ক্ষিপ্রতা, উদ্যোগ এবং ধারাবাহিকতা। ইদানিংকার কয়েক দশকে, এক বিশেষভাবে আইনের ব্যাখ্যা মারফত অন্যান্য অঙ্গের এলাকায় পা বাড়ানোর (আদালতের অতি সক্রিয়তা) বারংবার অভিযোগ উঠেছে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা এমনই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে ২০০৭-এর ৩ ডিসেম্বর, লোকসভায় বিষয়টি নিয়ে ওঠে বিতর্কের ঝড়। আইনসভা এবং প্রশাসনের কাজকর্মে আদালতের নাক গলানোর অভিযোগে সব দলের সদস্যরা বিচার বিভাগের সমালোচনায় মুখর ছিলেন। বর্তমান আইনের ব্যাখ্যা করে নয়, বিশেষ কোনও আদালত বা আদালতগুলির মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতি তৈরি এবং রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়ে আদালত প্রায়শই আইন খাড়া করতে চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে, বিচার বিভাগও মনে করে যে সরকার চায় তাকে বশে আনতে। ব্যাপারটার অবনতি ঘটে, যখন ২০০৫-এর ২৩ আগস্ট, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে সংরক্ষণের মতো রাজনৈতিক বিষয়ে দূরে থাকার পরামর্শ পেয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করে। এধরনের ধমক আদালত সচরাচর দেয় না। সে সময়কার অ্যাটর্নি জেনারেল এই মন্তব্য করতে ছাড়েননি যে ''আমাদের বলুন, আমরা আদালত গুটিয়ে ফেলব এবং তখন আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন।''

তবে, আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার নামে, শীর্ষ আদালতের গুটিকয়েক রায় স্পষ্টতই গণ্ডি ভেঙ্গে অন্যদের সীমায় অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছে। এই যুক্তির ভিত্তিতে শীর্ষ আদালতের দেওয়া নির্দেশে আইনের শক্তি আছে। বিদেশিদের ভারতীয় শিশু দত্তক নেওয়া এবং স্বেচ্ছামৃত্যুতে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য পদ্ধতি স্থির করতে, সুপ্রিম কোর্ট রীতিনীতি ঠিক করে দিয়েছে। *বিশাখা বনাম রাজস্থান রাজ্য* মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট আইন প্রণয়নের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য তার উদ্বেগ জানিয়েছে এবং কর্মস্থলে যৌন লাঞ্ছনা থেকে মেয়েদের সুরক্ষায় নীতিনির্দেশিকা ঠিক করে দিয়েছে।

অনুরূপভাবে, *ডি. কে. বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য* মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট গ্রেপ্তার করার সময় পালনীয় নীতিনির্দেশিকা বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, ঠিক করে দিয়েছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধিকার-সহ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির সব অধিকার। এছাড়া, আদালত আদেশ দেয় যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কোনও খামতি থাকলে প্রশাসন তা ভরাট করবে। প্রশাসন যদি না করে, বিচার বিভাগের তা করা উচিত। তবে, ওই নির্দেশ *ডি. সি. ওয়াধাওয়া বনাম বিহার রাজ্য* মামলায় ঘোষিত নীতিকে অস্বীকার করেছে যে প্রশাসন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ফাঁক পূরণ করলেও অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স আইনের স্থান নিতে পারে না। বিহার আইনসভা তার আইন তৈরির ভূমিকা এড়িয়ে যাচ্ছিল এবং রাজ্যটির শাসন চলছিল অধ্যাদেশ মারফত। অধ্যাদেশগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তা নিয়মিতভাবে ফের জারি করা হ'ত। গোটা দেশে নিম্ন আদালতের পরিষেবায় সঙ্গতি বা অভিন্নতা আনতে,

আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বভারতীয় বিচার কৃত্যক (All India Judiciary Service) গড়ার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট এই সার্ভিস গঠনের ক্ষমতা রাখে না, কেননা তা ৩১২ ধারা ভঙ্গ করার শামিল। ওই ধারা অনুযায়ী সর্বভারতীয় কৃত্যক গড়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র সংসদের।

সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতা

ভারতের সংবিধান ১৪২ ধারা মারফত সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে পরিপূর্ণ বিচার করতে। টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালত কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যালয়ের তদন্তে বাধা দিতে পারবে না। এই আদেশ সত্ত্বেও, দিল্লি হাইকোর্টে রিট পিটিশান দাখিল হয়। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বলা হয়, জনস্বার্থে টু জি স্পেকট্রাম মামলা যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা দরকার এবং সেজন্য একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তের আবেদন বিবেচনা করে দেখার উপযুক্ত, এই আদেশ বৈধ বলে ঘোষিত হয়। কয়লা খনি ব্লক মকদ্দমার তদন্তেও সুপ্রিম কোর্ট নজরদারি চালায়। নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে তদন্ত বা বিচারে স্থগিতাদেশের আর্জি জানানো যাবে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টে এবং অন্য কোনও আদালতে তা গ্রাহ্য হবে না। বস্তুত, ভারতে আইন পদ্ধতির গোটা আবহ বিকশিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা ১৪২ ধারা আবাহন মারফত। শীর্ষ আদালত চারপাশে ঘিরে থাকা কারখানা থেকে ছড়ানো গন্ধক (সালফার)-এর ধোঁয়ার দরুন তাজমহলের সাদা ধপধপে পাথরকে হলদেটে হয়ে যাওয়ার হাত থেকে শুধু বাঁচায়নি বরং বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে সাহায্য করেছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এম. এন. বেঙ্কটচেলিয়ার নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বিধিবদ্ধ সংস্থানের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করে দিলে সুপ্রিম কোর্টের সেই হস্তক্ষেপ সকলের বাহবা কুড়োয়। ১৪২ ধারার বলে বলীয়ান হয়ে শীর্ষ আদালত বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক কারণে বিচার পেতে বঞ্চিতদের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে স্বতঃসক্রিয় হয়েছে। অসহায় গরিব ও মূক মানুষজনের কণ্ঠ বা মুখপাত্র হয়ে উঠে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে বিচার ব্যবস্থার বিবর্তনে মূল খুঁটির ভূমিকা পালন করেছে।

সুশাসনের জন্য চাই সরকারের তিনটি স্তম্ভ, প্রশাসন, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য। এই তিন স্তম্ভ একে অন্যের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রাখবে। প্রধানমন্ত্রী যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, ''তারা একই পরিবারের সদস্য...কাউকে সঠিক অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত করার দরকার নেই। আমরা আমাদের শক্তি জানি, আমরা জানি আমাদের দুর্বলতা।'' *সরকারি কেতাকানুনের বোঝা কমানো, জনমুখী প্রশাসন* (Minimum government maximum governance)-এর মন্ত্র মারফত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস (together with all, development for all, the trust of all)-এর অ্যাজেন্ডা রূপায়ণের জন্য পরিবর্তিত দৃশ্যপটে, তিন অঙ্গকে মাথা খাটাতে হবে কীভাবে এগোন যায়। এটা মহাত্মা গান্ধী ঘোষিত, ''গণতন্ত্র বলতে আমি বুঝি এমন কিছু যা সবলের মতো দুর্বলকেও একই সুযোগ দেয়'', অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত অর্থকে জোরদার করে তোলে। এটা ড. আম্বেডকারের সাংবিধানিক দূরদর্শিতাও পূরণ করবে। ড. আম্বেডকারের স্বপ্ন ছিল প্রতিটি নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, সমান সুযোগ, তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং মূল্য সুনিশ্চিত করা।

পরিশেষ

ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতপক্ষে একেবারে কড়াকড়িভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বে সায় দেয়নি। তবে সরকারের বিভিন্ন শাখা বা অংশের কাজকর্মে যথেষ্ট ফারাককে স্বীকার করেছে। সরকারের প্রতিটি অঙ্গকে আইন তৈরি, প্রশাসন ও বিচার এই তিন ধরনের কাজই করতে হয়। এছাড়া, প্রতিটি অঙ্গ কিছু ক্ষেত্রে অন্য অঙ্গের উপর নির্ভরশীল বলে তা নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য বজায় রাখে। এর মানে এই নয় যে ক্ষমতা বিভাজনের নীতি একেবারে পরিত্যাগ করা হয়েছে। একটি অঙ্গ অন্যের একান্ত নিজস্ব কাজকর্মে হাত দেবে না এই নীতি মোটামুটি মেনে চলা হয়। তবে ব্যতিক্রম আছে বইকি! যেমন, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগ, আইনসভা এবং প্রশাসন এই তিন স্তম্ভের উপর সরকারের কাজের সাফল্য নির্ভর করে। দ্বন্দ্ব নয়, মানুষের কল্যাণ এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির মসৃণ কাজকর্মের জন্য ভারসাম্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভারত সংবিধানের কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে। এখানে সংসদের ক্ষমতা সংবিধানের বেঁধে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংসদ বা বিচার বিভাগ, কে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, প্রশ্নটি এমন নয়, বরং অন্যের এক্তিয়ারে নাক না গলিয়ে বিভিন্ন স্তম্ভের মধ্যে ভারসাম্য আনা দরকার। জনগণের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এবং তাকেই চরম গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে লালনপালন ও জোরদার করতে কার্যকর শাসনের বন্দোবস্ত করাটাই মোদ্দা কথা।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Ranjan, Sudhanshu. '*Justice, Judocracy and Democracy in India*', Routledge, New Delhi (2012)

(২) Choudhary, Sujit; Khosla, Madhav; Mehta, Pratap Bhanu, '*The Oxford Handbook of The Indian Constitution*', Oxford University Press, New Delhi (2016)

(৩) Sathe, S. P. '*Administrative Law*', LexisNexis, New Delhi, Seventh Edition (2006)

(৪) Khurshid, Salman; Luthra, Sidharth; Malik, Lokendra and Bedi, Shruti. '*Judicial Review Process, Powers and Problems*', Cambridge University Press, New Delhi (2020)

(৫) Dhavan, Rajeev. '*The Constitution of India: Miracle, Surrender, Hope*', LexisNexis, Gurgaon (2017)

(৬) https://www.outlookindia.com/website/story/after-ravi-shankar-cjis-tug-of-war-judicial-activism-pm-modi-bats-for-cooperatio/304838)

(৭) https://www.mkgandhi.org/articles/democracy.htm

বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ভারতীয় সংবিধান

মনোজ কুমার সিংহ

দেশের বিদেশ নীতির ভিত্তি কী হবে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। ৫১ নম্বর ধারার মূল প্রসঙ্গই হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও নির্ভরশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, কোনও দেশই আজ আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রযোজ্য আইনগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে না।[১] প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব প্রসার মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে গোটা পৃথিবীকে। এই প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচারের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে আন্তর্জাতিক আইনগুলির সংস্থান প্রযোজ্য হওয়া একান্ত জরুরি। সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার, পরিবেশ দূষণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, এসব প্রশ্নে একটা নির্দিষ্ট নিয়মবিধি থাকা জরুরি, যা বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে প্রযোজ্য আইনের অতিরিক্ত। এজন্যই একবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেকগুণ। বস্তুত, কোনও দেশের পক্ষেই আজ দুনিয়ার বাকি অংশের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এমনকি উপ-আঞ্চলিক স্তরেও বোঝাপড়া ও সমঝোতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবিরত বার্তালাপ হয়ে চলেছে। এইসব সমঝোতা বা চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে এবং দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় রয়েছে। উন্নয়ন এবং আন্তর্জাকি আইন প্রণয়নের প্রশ্নে পশ্চিমের দেশগুলির একাধিপত্য কমছে ধীরে ধীরে। এর পেছনে বড়ো ভূমিকা রয়েছে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির। রাষ্ট্রসংঘের ওপর ভারতের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অটুট রয়েছে বিশ্ব সংস্থাটির জন্মলগ্ন থেকেই।

সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক লেখাজোখা এবং পঠনপাঠনে ইউরোপীয় ধাঁচের বক্তব্য তুলে ধরেছেন পশ্চিমী দেশগুলির পণ্ডিতবর্গ। কিন্তু, এই বিষয়ে ভারত[২] এবং অন্য আরও প্রাচীন সভ্যতার মানুষ বলে গেছেন অনেক আগেই। ব্যক্তির মর্যাদারক্ষা এবং শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শ ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা। বিভিন্ন ধর্ম ও ধ্যানধারণার অনন্য রসায়ন ভারতের সংস্কৃতি।[৩] এখানকার মাটি যে বিশ্বজনীনতা ও ঐক্যের কথা বলে তার ব্যাপ্তি ভৌগোলিক সীমার অতীত। 'মানুষ অভিন্ন এক জাতি', বলেছে ঋক্‌বেদ। 'সর্বধর্ম সম্মান'-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারত। প্রাচীন ভারতে সার্বিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কর্মহীন, প্রবীণ-বিধবা-অনাথদের জন্য বিমার সমতুল ব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো সামাজিক উদ্যোগ যথেষ্ট জোরদার ছিল। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাজা এধরনের উদ্যোগ নেবেন এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part-III) ব্যক্তির কিছু মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে 'মৌলিক শব্দটির ব্যাখ্যা হল এই যে এসব অধিকার স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিমানুষের প্রাপ্য এবং তা প্রয়োজনীয়ও বটে। মৌলিক এই অধিকারগুলি সভ্য সমাজের মূল ধারণাকেই তুলে ধরে। সেজন্য বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সংবিধান প্রণেতারা। ব্যক্তির মর্যাদা এবং পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আবশ্যিক শর্ত হল এগুলি। কোনও

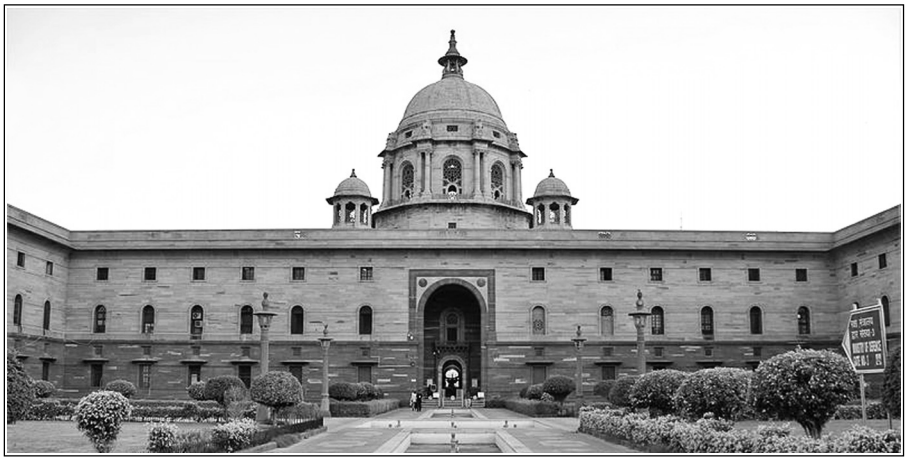

[লেখক অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউট, নতুন দিল্লি। ই-মেল : manoj_kumarsinha@yahoo.com]

আইন, অধ্যাদেশ, রীতি বা প্রশাসনিক নির্দেশের ক্ষমতা নেই ব্যক্তির মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার। সংবিধান প্রদত্ত এই মৌলিক অধিকার কেউ পরিত্যাগ করতেও পারেন না, এমনটাই মনে করে ভারতীয় সমাজ।[৪] দেশের বিদেশ নীতির ভিত্তি কী হবে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান।[৫] ৫১ নম্বর ধারার মূল প্রসঙ্গই হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।[৬] এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির কিছু করার নেই।[৭] এই ধারাটি সরাসরি বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রের আলোচ্য পরিসরের বাইরে থাকা 'অধ্যায়-চার' (Part-IV)-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, দেশের বিদেশ নীতির প্রশ্নে তার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।[৮] আন্তর্জাতিক আঙিনায় শান্তি ও নিরাপত্তা ভারতের সার্বিক বিকাশের আবশ্যিক শর্ত, এই অভিমত ছিল গণপরিষদের সদস্যদের। সেই অনুযায়ী, সংবিধানের ৫১ নম্বর ধারা অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলে। ৫১(ঘ) ধারায় বলা হয়েছে সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আঙিনায় বিরোধগুলির মীমাংসায় উদ্যোগী হবে রাষ্ট্র। এই বক্তব্যের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় অহিংসার দর্শনে। ৫১(গ) ধারা সমঝোতা বা চুক্তি নিয়ে কথা না বললেও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার দায়িত্ব দিয়েছে রাষ্ট্রের কাঁধে। রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্কেও যথাবিধি দায়িত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। ভারত যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে, সেগুলি ২৫৩ নং ধারা মোতাবেক প্রণীত আইনি সংস্থান ব্যাতীত পুর আইনের মতো সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় কিনা সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে ৫১(ক) ধারায় কিছু বলা নেই। ২৫৩ ধারা বলছে, এই অধ্যায়ে যাই লেখা থাক না কেন, অন্য কোনও দেশের সঙ্গে চুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের আছে এবং ওই আইন দেশের সমগ্র অঞ্চলে অথবা অংশবিশেষে কার্যকর হতে পারে।

বলা যেতেই পারে যে ২৫৩ নং ধারা একটি ইতিবাচক-দ্বৈতবাদী 'রূপান্তর মতাদর্শ'-এর কথা বলেছে।[৯] এই ধারা ৫১(ক) ধারায় ঘোষিত লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর এবং তার রূপায়ণের বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় ব্যবস্থায় এইসব চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তা আইনগ্রাহ্য হতে হলে ২৫৩ নং ধারার আওতায় আইন প্রণয়ন করতে হবে সংসদকে।[১০] ২৪৬ নং ধারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। ২৪৬(ক) ধারায় বলা হয়েছে, 'সপ্তম তপশিলের তালিকা-১-এ (কেন্দ্রীয় তালিকায়) উল্লিখিত বিষয়াবলী সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার রয়েছে সংসদের হাতে।'[১১]

ভারতীয় বিচার বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইনের নীতির প্রতি দায়বদ্ধ রাষ্ট্র, এই প্রতিষ্ঠিত রীতির থেকে বিচ্যুত নয় ৫১(ক) ধারা। সোজা কথায় বলতে গেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন না হলে কোনও চুক্তি আদালতের কাছে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু, বেশ কয়েকটি মামলায় রায়ে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট আইন না থাকলেও প্রশাসনিক স্তরে চুক্তি রূপায়ণ সম্ভব। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন মামলার খতিয়ান থেকে এক্ষেত্রে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' নীতির আভাস মেলে।

মজার কথা হল, বহু সময়েই আন্তর্জাতিক চুক্তির বিভিন্ন সংস্থান অভ্যন্তরীণ আইনের ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো হয়েছে। কোনও মামলায় নির্দিষ্ট কোনও পক্ষের অংশগ্রহণের অধিকার (Locus Standi)-এর বিষয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই অবস্থান অনেক নমনীয় করেছে শীর্ষ আদালত। খোলা মনে প্রশাসনিক কাজকর্মের পর্যালোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলির কার্যকর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে চাইছে শীর্ষ আদালত এবং উচ্চ আদালতগুলি।[১২] এর ফলে জনস্বার্থ মামলার সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। সূচনা হয়েছে 'পত্রভিত্তিক' (epistolary) বিচার রীতির মতো নতুন প্রণালী, যেখানে কোনও ব্যক্তির লেখা চিঠি বা টেলিগ্রাম এমনকি সংবাদপত্রের লেখার ওপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আদালত। অভাবী মানুষকে আইনি সহায়তাও দেওয়া হয়। জীবনধারণের অধিকার, 'ব্যক্তি স্বাধীনতার মতো মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বিচার বিভাগ। সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তার দিকটিও এখানে উল্লেখ্য।[১৩]

সংসদের কাজকর্মের সঙ্গে অসামঞ্জস্য না থাকলে দেশে নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন না করেও আন্তর্জাতিক আইনগুলির সংস্থানের মূল বিষয়টি জাতীয় আইন সংক্রান্ত নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, একথা বারবার বলেছে শীর্ষ আদালত। তবে এক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য থাকলে দেশ ও সংসদের সার্বভৌমত্ব কোনওভাবেই বিদেশি আইনের মাধ্যমে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যাবে না।[১৪] আর, আন্তর্জাতিক আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংসদের মতামতই শেষ কথা। বিশাখা এবং অন্যরা (Vishaka and Others) বনাম রাজস্থান সরকার মামলায়[১৫] ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট 'রূপান্তর তত্ত্ব' থেকে 'অন্তর্ভুক্তি তত্ত্ব'-এর দিকে হেঁটেছে বলে মনে হয়। মামলাটি ছিল কর্মস্থানে যৌন নিগ্রহের হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষার মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকারকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা সংক্রান্ত। সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৯(১)(ছ) ধারার ওপর ভিত্তি করে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে

যে, মৌলিক অধিকারের ধারণার বিরোধী না হয়ে তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হলে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রীতিকেও সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিচার্য হিসেবে দেখা যেতে পারে।(১৬)

ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিচার পরিমণ্ডল এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যা ব্যক্তি মর্যাদারক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের আন্তরিকতাকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে। ব্যক্তি মর্যাদা সম্পর্কিত মানবাধিকারের বিষয়টি সরাসরি বলা আছে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায়। মানেকা গান্ধী বনাম ভারত সরকার মামলার আগে ২১ নম্বর ধারায় উল্লিখিত মানবাধিকার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা হ'ত খুবই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ওই মামলাটির রায় মানবাধিকার সংক্রান্ত বিচারের ধারণাতে নতুন দিক খুলে দিয়েছে। মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে, আইনের একটি প্রণালীই সব কিছু নয়। ওই প্রণালী হতে হবে যুক্তি নির্ভর এবং মানবিক। তা না হলে সংশ্লিষ্ট আইনটি সংবিধানের ২১ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করছে বলে ধরতে হবে। বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট প্রাসঙ্গিক মানবাধিকারের বিষয়টিকে আদালতে গ্রহণযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। বিচার পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছে দিতে এসেছে জনস্বার্থ মামলার মতো ব্যবস্থা। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দরিদ্র মানুষ পত্র মারফত বিচার চাইতে পারেন আদালতের কাছে। দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার যে অগণিত মানুষ তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করে মানবাধিকারের বিষয়টিকে অর্থবহ করে তুলতে চায় আদালত।

শেষপাত

মানবাধিকার-সহ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অপরিহার্য বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে ভারতীয় সংবিধান। বর্তমানে মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে বিচারবিভাগ অত্যন্ত সক্রিয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিবেচ্য বিষয়গুলি স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীতে বিদেশ নীতি প্রণয়নের সময় বিশেষভাবে বিবর্তিত হয়েছে। সংবিধানের ৫১ নম্বর ধারা সারা বিশ্বের সামনে ভারতের আসনকে গৌরবান্বিত করেছে।

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সহায়ক ওই ধারাটি।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) David Held and Anthony McGrew (ed.), The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalisation Debate 51 (Polity Press, 2003).

(২) R.P. Anand, Asian States and the Development of Universal International Law (New Delhi, 1972).

(৩) V.S. Mani, "Human Rights and the United Nations: A Survey", Journal of the Indian Law Institute, vol.40 (1998), pp. 38-66.

(৪) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation & Ors. 1986 AIR 180

(৫) P. C. Rao, The Indian Constitution and International Law (Taxman, New Delhi, 1993), p.3.

(৬) Articles 73, 254(2) and 253 and entries 1 and 10 to 21 of the Union list in the Seventh schedule to the Constitution. For details *see*, Rao, *Ibid*, 126-78.

(৭) Rao, *Supra* 5, p.5.

(৮) Upendra Baxi "The Little Done, the Vast Undone Some Reflections on Reading Granville Austin's the Indian Constitution", *Journal of Indian Law Institute*, vol.9, no.2, 1967, pp.323-430

(৯) V.G. Hegde, "Indian Courts and International Law", *Leiden Journal of International Law,* vol.23 (2010), pp.53-57.

(১০) M.P. Singh, V.N. Shukla's Constitution of India (Eastern Book Company, Lucknow, 2008), 11th ed

(১১) Entries 13, 14, 15 and 16 in the Union List are relevant, particularly Entry 14. They read as follows :

a) Participation in international conferences, Associations and other bodies and implementing of decisions made threat.

b) Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries.

c) War and peace.

d) Foreign jurisdiction

(১২) Baxi, Upendra, *Courage, Craft and Contention the Indian Supreme Court in the Eighties* (Bombay: N.M. Tripathi, 1985)

(১৩) Manoj Kumar Sinha, "Minority Rights: A Case Study of India" *International Journal of Minority and Group Rights,* vol. 12, n .4 (2005), pp. 325-354.

(১৪) Rao, *Supra* note 5.

(১৫) AIR 1997 SC 3011.

(১৬) *Ibid*.

নারীর অধিকার : অঙ্গীকার ও পদক্ষেপ

ড. কে. শ্যামলা

সমাজে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় সরকার কতখানি সফল হয়েছে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাত দশক পরে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। সমাজে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও মানবাধিকার চুক্তি অনুমোদন করেছে ভারত।

প্রস্তাবনায় সংবিধানের যে মূল নীতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে শুধুমাত্র সামাজিক সাম্য সুনিশ্চিত করাই নয়, মহিলাদের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া ও তাদের সম্মান রক্ষার ওপরও বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যে মৌলিক অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ১৪, ১৫(১) ও ১৬(২) ধারায় লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে যেকোনও রকম বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে ৩৯(এ), ৩৯(সি) এবং ৪২ নং ধারায় সরকারি আইন ও নীতিতে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৫১এ(ই) ধারায় বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যে মহিলাদের প্রতি অবমাননাকর সমস্ত আচরণ বন্ধ করা ও দেশের সব মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে [১৫(৩) ধারা, ২৪৩ ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি]।

সংবিধানের ৫১এ(ই) ধারায় বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যে মহিলাদের প্রতি অবমাননাকর সমস্ত আচরণ বন্ধ করা ও দেশের সব মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে [১৫(৩) ধারা, ২৪৩ ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি]।

সমাজে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় সরকার কতখানি সফল হয়েছে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাত দশক পরে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। সমাজে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও মানবাধিকার চুক্তি অনুমোদন করেছে ভারত। আন্তর্জাতিক যে চুক্তিগুলির প্রতি ভারত দায়বদ্ধ তার মধ্যে রয়েছে : মহিলাদের প্রতি সমস্ত রকম বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি (CEDAW), ১৯৯৩; মেক্সিকো কর্মপরিকল্পনা, ১৯৭৫; নাইরোবি ফরোয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজিস, ১৯৮৫; বেজিং ঘোষণাপত্র ও পদক্ষেপ গ্রহণের মঞ্চ (প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন), ১৯৯৫ এবং ২০২০। নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচি [ইউএন উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি (WPS) অ্যাজেন্ডা] গ্রহণ

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক। রাঁচির ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চে সাংবিধানিক আইন পড়ান। ই-মেল : k.syamala@nusriranchi.ac.in]

করেছে ভারত এবং সেইসঙ্গে WPS বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণেও ভারত দায়বদ্ধ। নারী, শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের WPS প্রস্তাব (S/RES/1325) বাস্তবায়নেও সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয়। এই নীতিগুলি রূপায়ণে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা তথা কার্যকরী আইনি কাঠামোর অভাব, মহিলাদের ওপর নির্যাতনের মামলাগুলির নিষ্পত্তিতে অযথা কালবিলম্ব, উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদির কারণে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা যেভাবে বেড়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ এতদিন কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে তা পর্যালোচনার সময় এসেছে।

লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক ব্যবস্থাসমূহ

- প্রস্তাবনা : সমাজতন্ত্র, সুযোগসুবিধা ও সহায়সম্পদের সম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়, প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা রক্ষা;
- ধারা ১৪ : আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও আইনের দ্বারা সমানভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার;
- ধারা ১৫(১) : লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ;
- ধারা ১৫(৩) : নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রকে ক্ষমতাদান;
- ধারা ১৬(২) : সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ; লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ;
- ধারা ৩৮ : সামাজিক ন্যায় ও সমান সুযোগ-সহ মানুষের কল্যাণে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে;
- ধারা ৩৯(এ) : জীবিকানির্বাহের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা;
- ধারা ৩৯এ : সমান বিচার ও বিনামূল্যে আইনি সহায়তা;
- ধারা ৪২ : কর্মস্থলে মানবিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা;
- ধারা ৫১এ(ই) : ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিক ও জাতিগত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার, মহিলাদের প্রতি অবমাননাকর সমস্ত রীতি ও প্রথা বন্ধ করা;
- ধারা ২৪৩ডি(৩) এবং (৪), ২৪৩টি(৩) এবং (৪) : পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে মহিলা প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় আইনি ব্যবস্থাসমূহ

- ভারতীয় দণ্ডবিধি : ধারা ৩৭৬-ধর্ষণ; ধারা ৩৬৩ থেকে ৩৭৩-বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অপহরণ; ধারা ৩০২/৩০৪বি-পণের জন্য হত্যা, পণের জন্য মৃত্যু বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা; ধারা ৪৯৮এ-শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার; ধারা ৩৫৪-শ্লীলতাহানি; ধারা ৫০৯-যৌন হয়রানি।
- বিশেষ আইনসমূহ :
  - ✶ কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন, ১৯৪৮
  - ✶ বাগিচা শ্রম আইন, ১৯৫১
  - ✶ পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৫৪
  - ✶ হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫
  - ✶ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬

- ✶ অবৈধ পাচার (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫৬
- ✶ মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১
- ✶ পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১
- ✶ চিকিৎসার কারণে গর্ভপাত আইন বা মেডিকেল টার্মিনেটশন প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৭১
- ✶ চুক্তি শ্রম (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭৬
- ✶ সম পারিশ্রমিক আইন, ১৯৭৬
- ✶ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬
- ✶ মহিলাদের অশোভনভাবে প্রদর্শন (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮৬
- ✶ সতীপ্রথা (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭
- ✶ গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০০৫ (দ্য প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট)
- ✶ শিশুদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান আইন (পক্সো), ২০১২
- ✶ কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ ও প্রতিবিধান) আইন, ২০১৩
- ✶ ফৌজদারি (সংশোধনী) আইন, ২০১৩
- ✶ ফৌজদারি (সংশোধনী) আইন, ২০১৮

এছাড়াও অন্যান্য আইন রয়েছে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে থাকে।

ভারত সরকারের অন্যান্য উদ্যোগ

- জরুরি অবস্থার জন্য সারা দেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনা (এমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম, ERSS)। এই ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে যেকোনও জরুরি অবস্থায় সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি নম্বর, ১১২ চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ঘটনার স্থান চিহ্নিত করা যাবে।
- মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় নীতি, ২০০১
- প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ পুলিশি ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা।
- মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল। এই পোর্টালে সাইবার স্পেস-এ প্রকাশিত অশ্লীল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রিপোর্ট করা যাবে।
- যৌন নিগ্রহকারীদের জাতীয় তথ্যভাণ্ডার (২০১৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর চালু হয়) তৈরি, যাতে যৌন অপরাধ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সহজেই তদন্ত চালানো যায়।

- ২০১৮ সালের ফৌজদারি আইন (সংশোধনী) আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যৌন নিগ্রহের ঘটনার তদন্ত হচ্ছে কিনা তার ওপর নজরদারি ও তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি চালু করা হয়েছে 'ইনভেস্টিগেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম ফর সেক্সুয়াল অফেন্সেস (ITSSO)'।
- যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া মহিলাদের চিকিৎসা সহায়তা, পুলিশি সাহায্য, আইন সংক্রান্ত ও মানসিক কাউন্সেলিং, আদালতে মামলা দেখভাল ও তাদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ৭০০-রও বেশি স্টপ সেন্টার গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫৯৫-টি সেন্টার ইতোমধ্যেই পুরোদস্তুর চালু হয়ে গেছে।

দেশে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত লক্ষ্য

- মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নতি ও ক্ষমতায়ন;
- রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত ও সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলা, মহিলারা যাতে খাতায়-কলমে ও হাতে-কলমে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা;
- মহিলারা যাতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান তার ব্যবস্থা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন;
- মহিলাদের প্রতি বৈষম্য ও তাদের ওপর হওয়া সমস্ত অপরাধের ঘটনা বন্ধ করতে আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;
- মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও অবমাননামূলক যে প্রথাগুলি চালু রয়েছে তার অবসান ঘটাতে সোশ্যাল রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্থাৎ, সামাজিক পরিবর্তনের মোকাবিলা তথা আগামী দিনে সমাজের বিকাশ ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা)-এর ব্যবস্থা;

- মহিলা শিশুকন্যাদের প্রতি সমস্ত রকমের বৈষম্য ও হিংসার ঘটনা প্রতিরোধ করা, এবং চাকরিবাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশে মহিলাদের উৎসাহদান।

দায়বদ্ধতা

নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করেছে ভারত :

- মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮
- পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বেজিং নীতি
- মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি, ১৯৫৪
- মহিলাদের প্রতি সমস্ত রকম বৈষম্য ও হিংসা দূরীকরণে ঘোষণাপত্র (DEVW), ১৯৯৩
- মহিলাদের প্রতি সব রকমের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত চুক্তি, (CEDAW)
- মহিলাদের প্রতি সব রকমের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের কমিটি (CEDAW)
- নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব
- বেজিং ঘোষণাপত্র ও পদক্ষেপ গ্রহণের মঞ্চ, ১৯৯৫ এবং ২০২০ ইত্যাদি।

নারী ও শিশুকন্যা পাচার, যৌন হয়রানি ও পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব তুলে ধরা ও তাদের জীবনরক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির সূচনা করেছে সরকার। মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবার মাধ্যমে বিশেষ ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। সরকার চালু করেছে জাতীয় যুব নীতি, ২০১৪। এই নীতির একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। এখানে অগ্রাধিকারমূলক এগারোটি ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলির প্রতিটি পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের বিধান দেওয়া হয়েছে।

ভারত সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) পূরণে দায়বদ্ধ। এই লক্ষ্যগুলি লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার চিত্রটাকে আমূল বদলে দেবে।

পদক্ষেপ

ভারত সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) পূরণে দায়বদ্ধ। এই লক্ষ্যগুলি লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার চিত্রটাকে আমূল বদলে দেবে। বিশ্বের মধ্যে এদেশে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশের কর্মীবাহিনীতে মহিলাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এদেশে। চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে এনে মহিলাদের দেশের কর্মীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা গেলে দেশে দক্ষ কর্মীর হারও বাড়বে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হলে সিদ্ধান্তগ্রহণ, উদ্যোগ গ্রহণ ও চাকরিবাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে। এতে দেশের আর্থিক বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত হবে।

ইদানীংকালে মহিলাদের ওপর নির্যাতন, বৈষম্য ও অপরাধ বাড়ছে। এর ফলে তাদের ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে আনার প্রচেষ্টা মার খাচ্ছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, কর্মস্থলে যৌন হয়রানি, লিঙ্গ বৈষম্য ও পারিবারিক হিংসার ঘটনা মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) 2020: A critical year for women, gender equality and health, Editorial, The Lancet, Vol.395, Issue 10217, P1, January 4, 2020, available at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33170-8/fulltext

(২) AkankshaKhullar, The Lukewarm Commitment: India and Gender Equality in Security Affairs, January23,2020, The Diplomat, available at https://thediplomat.com/2020/01/a-lukewarm-commitment-india-and-gender-equality-in-security-affairs/

(৩) Dr P. J. Sudhakar, Protection of Human Rights of Women, published on March 11,2015, Press Information Bureau, Government of India, available at https://pib.gov.in/newsite/mbErel.aspx?relid=116782

(৪) Gender Equality and Empowerment, https://in.one.un.org/task-teams/gender-equality-and-empowerment/

(৫) Gender Equality and Empowerment, UN India, available at https://in.one.un.org/task-teams/gender-equality-and-empowerment/

(৬) Gender Equality and Youth Development, UN in India, available at https://in.one.un.org/gender-equality-and-youth-development/

(৭) https://www.unwomen.org/en

(৮) India's inequality crisis hurts girls and women the most, World Economic Forum, 06 February 2019, available at https://www.weforum.org/agenda/2019/02/india-s-inequality-crisis-hurts-girls-and-women-the-most

(৯) Landmark resolution on women, peace and security, OSAGI, available at https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/

(১০) National Policy for the Empowerment of Women (2001), available at https://wcd.nic.in/womendevelopment/national-policy-women-empowerment

(১১) No trend of increasing crimes against women in India: Shri G. Kishan Reddy, posted on December 4, 2019, available at https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1594856

(১২) Sustainable Development Goals (SDGs), available at https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

(১৩) The Beijing Platform for Action: Inspiration Then and Now, available at https://beijing20.unwomen.org/en/about

এক সজীব দলিল

মহিমা সিং

সংবিধানে যে সংশোধনগুলি হয়েছে, তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন। সংবিধানের রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা যে কতটা স্বচ্ছ ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই কথাগুলো থেকে, "একটা সংবিধান যত ভালোই হোক না কেন, যারা এটি প্রয়োগ করছেন, তারা যদি খারাপ হন, তাহলে সেটি তার কার্যকারিতা হারাতে বাধ্য। আবার যারা প্রয়োগ করছেন, তারা যদি মানুষ হিসাবে ভালো হন, সেক্ষেত্রে একটি খারাপ সংবিধানও তার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ভালো হয়ে উঠতে পারে।"

বিশ্বমানের ঝাঁ চকচকে আকাশ-চুম্বী ইমারতে বসে সুগন্ধী ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিতে দিতে বিশাল কাঁচের জানালা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে যে ভারতীয় নব্যযুবক আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, ইতিহাস সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই সীমিত। তার অজ্ঞানতা তাকে ক্রমাগত ঐতিহাসিক ঘটনা অস্বীকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যে বাক্‌স্বাধীনতা আজ ভোগ করি, তারই সুবাদে আমরা নিজেদের জাতি গঠনকারীদের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারছি। অথচ এই বাক্‌স্বাধীনতাও তাদেরই দান। তাই কেউ যখন প্রশ্ন তুলছেন, ঠিক তখনই আরেকজন সমসাময়িক ভারতীয় ভাবুক বিশাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা কীভাবে এসেছে, তা দেখাতে পারেন।

বিভিন্ন স্তরে আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্ধশতাব্দী জোড়া বহু চিন্তাভাবনা, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল হল একটি লিখিত দলিল। এই জাদু দলিল, যাকে আমরা ভারতীয় সংবিধান বলি, তার প্রতিটি অক্ষর লেখা হয়েছে ভারতীয়দের রক্ত-ঘাম-অশ্রু দিয়ে। সেইসব ভারতীয়, যাদের মতো বৈষম্য, অত্যাচার, দুঃখদুর্দশা ও দাসত্বের জ্বালা আর কাউকে সইতে হয়নি। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দলিল তাই নিছক এক দলিল নয়, এক সজীব সনদ। বিশেষ করে ভারত যখন বর্তমান সামাজিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ হয়ে ওঠার পথে যাত্রা শুরু করেছে, এই সজীব সনদ তখন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, প্রথাগত ব্যাখ্যার পরিধি ছাপিয়ে এর অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য প্রতিটি নাগরিকের অনুধাবন করার সময় এসেছে।

সংবিধানের আত্মা হলেন নাগরিকরা। সংবিধান গৃহীত হবার পর দশকের পর দশক কেটে গেছে, কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতা বিন্দুমাত্র কমেনি। আজ, এই পঞ্চম প্রজন্মের নাগরিকদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেও একইরকম কার্যকর। সংবিধানে যে সংশোধনগুলি হয়েছে, তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন। সংবিধানের রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা যে কতটা স্বচ্ছ ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই কথাগুলো থেকে, "একটা সংবিধান যত ভালোই হোক না কেন, যারা এটি প্রয়োগ করছেন, তারা যদি খারাপ হন, তাহলে সেটি তার কার্যকারিতা হারাতে বাধ্য। আবার যারা প্রয়োগ করছেন, তারা যদি মানুষ হিসাবে ভালো হন, সেক্ষেত্রে একটি খারাপ সংবিধানও তার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ভালো হয়ে উঠতে পারে।"

সাধারণ পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে প্রথম যে নথিটি লিখিত আকারে প্রকাশ পেয়েছিল, সেটি হল ভারতীয় সংবিধান বিল, ১৮৯৫, যাকে চলতি ভাষায় বলা হ'ত স্বরাজ বিল। এটি আসলে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিখ্যাত উক্তি, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করেই ছাড়ব"-র আইনি রূপ। এতে ১১০-টি ধারা ছিল এবং এখানেই প্রথম বাক্‌স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সমানাধিকারের মতো বিভিন্ন ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বলা হয়। শুধু তাই নয়, ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে সুশাসনের জন্য জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার পৃথকীকরণের কথাও এই নথিতেই প্রথম বলা হয়। পরবর্তীকালে এটাই সরকারের বিভিন্ন স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের সংবিধান চার ধরনের ক্ষমতার কথা বলে : (ক) সার্বভৌম ক্ষমতা, (খ) আইনসভাগত ক্ষমতা, (গ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং (ঘ) প্রশাসনিক ক্ষমতা। আবার উলটোদিকে এইসব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হল ভারতের সংসদ, এটিই শীর্ষ। বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হল আইনসভার ক্ষমতার

[লেখক আইনজীবী এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সদস্য। ই-মেল : advocatemahima7@gmail.com]

অধীনে। একদিকে বলা হয়েছে, ''এই বিল সব নাগরিককে অস্ত্রধারণের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করছে'' দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের প্রতিরোধের জন্য, আবার অন্যদিকে আইনের মাধ্যমে এর সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

এই বিলে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের অধিকারে থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা হয়েছে, ''প্রতিটি ভারতীয়ের নাগরিকত্ব'' সুরক্ষিত থাকবে। এই নাগরিকত্ব লুপ্ত হবে যদি, (১) কেউ বিদেশি কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেন, (২) কেউ যদি ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া বিদেশি রাষ্ট্রের কোনও পদ, পেনশন বা সম্মান গ্রহণ করেন, এবং (৩) কাউকে যদি নির্বাসন দেওয়া হয়। একজন ভারতীয় নাগরিক তার রাজনৈতিক অধিকার হারাবেন, যদি, (১) তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অযোগ্য হন, এবং (২) তাকে কারাদণ্ড অথবা নির্বাসন দেওয়া হয়, তাহলে সেই সাজা ভোগের সময়কাল পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বিলটি কখনওই আইন হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি এবং সঙ্কট গভীরতর হয়েছে।

স্বশাসনের এই তীব্র বাসনাকে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদীরা পূর্ণ সমর্থন জানান এবং মর্লে-মিন্টো সংস্কারের সুবাদে ১৯০৯ সালে ইন্ডিয়া কাউন্সিলস অ্যাক্ট আনা হয়। এই আইনে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আচরণের নিন্দা করে একে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যা দেওয়া হয়। লর্ড মিন্টো বোঝেন, স্বশাসনের দাবিকে নিয়ে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। বিভাজনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা বলেন।

এর বিরুদ্ধে যাবতীয় বিক্ষোভ ও আন্দোলন একেবারে নিষ্ফল হয়নি, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। ঠিক এক দশক পর ১৯১৯ সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আনা হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে এটি প্রত্যাখ্যান করে। অ্যানি বেসান্ত বলেন, এই প্রস্তাব ইংল্যান্ডের পক্ষে দেওয়া সমীচীন নয়, ভারতের পক্ষেও তা গ্রহণ করা অসম্ভব। ড. বি. আর. আম্বেদকর একে 'ভারতের ব্রিটিশ সংবিধান' বলে কটাক্ষ করেন।

এরপর, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে যখন লর্ড আরউইন ভারতকে ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডের সর্বস্তরে এর তীব্র সমালোচনা হয়। চাপে পড়ে ১৯২৯ সালে আরউইন জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বলা হলেও এক্ষুনি তা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর লাহোরে পরবর্তী বৈঠকেই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব আনা হয়। সাড়ে সাতশো শব্দের এই নথিটি প্রকাশ্যে আসে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সবাই অনুভব করতে থাকেন, স্বাধীনতা আমাদের অধিকার। এটা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, সুপ্রাচীন এক সভ্যতার প্রাপ্য, কারও দয়ার দান নয় যে আমাদের তা ভিক্ষা করতে হবে। প্রকাশিত নথিতে এই কথাগুলিই দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় :

''ব্রিটিশ সরকার শুধু যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে তাই নয়, সাধারণ মানুষকে শোষণ করে ভারতকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস করছে।''

এই নথিতে খুব স্পষ্টভাবে ভারতের মানুষের দুঃখদুর্দশা ও বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে। তথ্যের পর তথ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, (১) কীভাবে সামঞ্জস্যহীন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের কষ্টার্জিত উপার্জন লুঠ করেছে, যার সব থেকে বেশি মাশুল দিতে হয়েছে দরিদ্র মানুষজনকে, (২) কীভাবে ভারতের গ্রামীণ হস্তশিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, (৩) কীভাবে অর্থ ও বিনিময় অনুপাতের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, (৪) ভারতের সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক প্রতিভাগুলিকে কীভাবে গ্রামের ছোট্ট অফিস আর কেরানিগিরির চৌহদ্দিতে বেঁধে রাখা হয়েছে, এমনকী অত্যন্ত প্রতিভাবানদেরও বাধ্য করা হয়েছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সামনে মাথা নত করতে, (৫) কীভাবে সুকৌশলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে মুক্ত চেতনার পরিবর্তে শৃঙ্খালিত থাকার দিকে তাকে চালনা করা হয়েছে, (৬) কীভাবে সুপরিকল্পিত প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে আমরা আমাদের নিজস্ব মেধা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি এবং ভাবতে থাকি যে, নিতান্ত দুর্বলতম শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

খুব শান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে :

''আমরা মনে করি, যে শাসন আমাদের দেশে এমন বিপর্যয় এনে দিয়েছে, তা সহ্য করে চলা মানুষ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধের শামিল। তবে আমরা এও স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা অর্জনের সব থেকে কার্যকর পন্থা হিংসা হতে পারে না। সেজন্য আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছা সংশ্রব যতটা সম্ভব পরিহার করব। আমরা অসহযোগ আন্দোলনের পথে হাঁটব, সরকারকে কর দেব না। আমরা মনে করি, যদি আমরা সর্বাত্মক অসহযোগিতার পথে যেতে পারি, কর দেওয়া বন্ধ করি এবং প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসায় না জড়াই, তাহলে এই অমানবিক শাসনের অবসান হতে বাধ্য।''

পরবর্তীকালে, এই লাহোর অধিবেশনকে স্মরণীয় করে রাখতে এই নথি প্রকাশের দিনটিতেই, অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়। এর মধ্যে অবশ্য করাচি প্রস্তাব ১৯৩১, পুণা চুক্তি ১৯৩২, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর মতো নানা মাইলফলক পেরিয়ে আসতে হয়েছে. প্রস্তুত করা হয়েছে সংবিধানের

বেশ কিছু খসড়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি।

অনেক চিন্তাভাবনার পর সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির দাবি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। তপশিলি জাতিভুক্ত (Scheduled Castes Federation, 1944), সংখ্যালঘু এবং রাজ্যগুলির রাজনৈতির দাবি সংক্রান্ত নথি প্রস্তুত করেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। ১৯৪৬ সালে মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রাথমিক নোট প্রস্তুত হয়। এইসব কিছুই ছিল এমন একটি নথি প্রস্তুতের জন্য, যার মাধ্যমে শেষ পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির চাহিদা ও অভাব-অভিযোগও মেটানো যাবে, ঠিক যেভাবে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে থাকা মানুষজনের কথা শোনা হয়।

১৯৪৬ সালে নারায়ণ আগরওয়াল তার গান্ধীবাদী সংবিধানে (যার মুখবন্ধ লিখেছেন গান্ধীজী নিজে) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত ভাবুক ও লেখকদের করা নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজের এক চমৎকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র এবং একনায়কত্বের কথা আসে, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় অহিংসা এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণের ওপর। এই নথিতেই প্রথম পঞ্চায়েতি রাজের কথা বলা হয়। লেখক বলেন, ''সমাজ যদি বিভাজিতই থেকে যায়, যাকে প্লেটোর ভাষায় বলা যায়, 'বড়লোকের শহর' ও 'গরীবদের শহর', সেক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্র অধরাই থেকে যাবে।'' একইসঙ্গে 'গ্রামকেন্দ্রিকতা' এবং 'বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ওপরেও জোর দেওয়া হয়, যেগুলিকে জাতির জনক একনায়কতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিককতার জোরালো প্রতিস্পর্ধী বলে মনে করতেন। বলা হয়, ''সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র, ব্যক্তিকে তার চালের ঘুঁটি বলে মনে করে। এইসব একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র, তা সে ফ্যাসিস্ট বা সমাজতন্ত্রী যাই হোক না কেন, আসলে পরিচালিত হয় কয়েকজন 'সুপারম্যান'-এর দ্বারা। তারাই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। এইসব সুপারম্যানরা যত মহান আর উচ্চাভিলাষীই হোক না কেন, মানুষকে বাঁচতে হলে এদের কবলমুক্ত হতেই হবে।'' গান্ধীবাদের ওপর আধারিত, প্রগাঢ় গবেষণার ফসল এই সংকলনটি মানুষের কাছে ততটা পরিচিত নয়। অথচ এখানেই আপোসহীন নির্বিকতায় বলা হয়েছে, ''যে মুহূর্তে অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্র তার দাঁত-নখ বের করে ফেলবে। সুবিধাভোগী শ্রেণি ততক্ষণই গায়কদের টাকা দেবে, যতক্ষণ গায়করা তাদের সুরেই গান গাইবে...।''

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে রক্ত-ঘাম-অশ্রুর আহুতি দেওয়া হয়েছে, তা স্মরণে রেখে খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা আজও এই দেশের উজ্জীবিত, কখনও কখনও কিছুটা অজ্ঞ, সাধারণ মানুষের প্রহরীর কাজ করে আসছে। যারা এই দেশের গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাদের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছে অসমসাহসী এই ক'টি শব্দ-We The People of India-আমরা ভারতের নাগরিকগণ।❑

আমাদের প্রকাশনা-APRIL 2020

History of the Freedom Movement in India

প্রথম খণ্ড (ইংরেজি) ● লেখক-ড. তারাচাঁদ ● প্রকাশিত ২০০০ কপি, মূল্য-১৭৫ টাকা

PDBN : HIS-ENG-REG-109-2019-20, ISBN : 978-81-230-3238-2

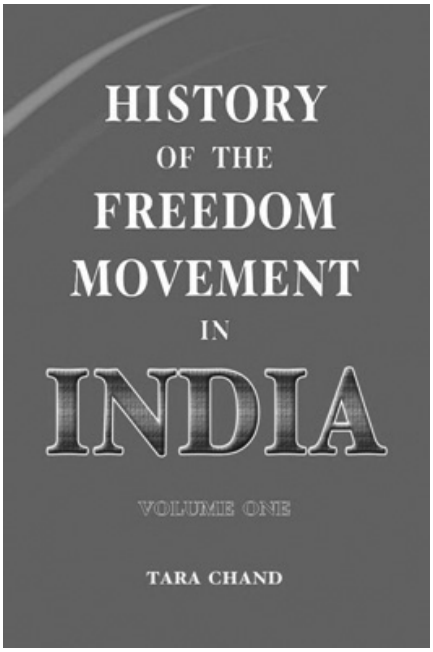

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এধরনের অন্যান্য সংগ্রামের তুলনায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক অর্থে অনন্য। মহান ভারতীয় সভ্যতাকে এক জাতি তথা এক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি ইতহাসের অন্যান্য বড়ো বড়ো জনপ্রিয় সংগ্রামের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করে এই আন্দোলন। শুধু বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, অযৌক্তিক বিদেশি তথা দেশীয় শাসকবৃন্দের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নৈতিক যুদ্ধও বটে। ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক জবাব হিসেবে পথ চলা শুরু। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের মাঝামাঝি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সাম্প্রতিক ইতিহাসে সূক্ষ্মতম জন আন্দোলন রূপে বিবর্তন। শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোটি কোটি নিরীহ ভারতীয়কে ক্ষমতায়িত করতে গান্ধীজীর হাতিয়ার ছিল সত্য ও অহিংসা। তাঁর এই অভূতপূর্ব কৌশল তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিশ্বনেতৃবৃন্দকে শান্তি ও অহিংসার পথ বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

History of Freedom Movement in India বইটির মোট চারটি খণ্ডে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. তারাচাঁদ সেই কঠিন সময়কালের সর্বোত্তম বিশ্লেষণাত্মক চিত্রটি তুলে ধরেছেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বিশ্বাসযোগ্য ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ শিক্ষাবিদদের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সমানভাবে জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

১। সংবিধান সভার (Constituent Assembly) সভাপতি কে ছিলেন?

২। সংবিধান সভার সংবিধান রচনা (Drafting) কমিটির প্রধান কে ছিলেন?

৩। কোন তারিখে রাষ্ট্রপতি সংবিধানে স্বাক্ষর করেন?

৪। সংবিধান কোন তারিখে কার্যকরী হয়?

৫। 'আইনের শাসন'-এর ধারণা কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

৬। ভারতের সংবিধানে কোন দেশের অনুকরণে 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা'-র ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

৭। কত-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাগুলি যুক্ত করা হয়?

৮। Indian Post Office (Amendment) Bill—এই বিলের ক্ষেত্রে প্রথমবার কোনও রাষ্ট্রপতি কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিলেন?

৯। কোন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথমবার এই রায় দিয়েছিল যে, সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তনযোগ্য নয়?

১০। কোন পদ/দপ্তরটিকে ড. আম্বেদকর সংবিধানের আওতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ/দপ্তর বলে অভিহিত করেছিলেন?

১১। কত রকমের ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut Motions) হয়?

১২। সংবিধানের কোন ধারার আওতায় হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে 'Writ' জারি করতে পারে?

১৩। কী ধরনের Writ জারির মাধ্যমে হাইকোর্ট সরকার বা কোনও সরকারি আধিকারিককে, কোনও একটি অসাংবিধানিক আইন যাতে প্রয়োগ না করা হয়, সেবিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে?

১৪। সংবিধান অনুযায়ী, অবশিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রের, কিন্তু কোনও বিষয় প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে পড়ে কি না, তা নির্ধারণ করার বিষয়ে কার মতামত চূড়ান্ত?

১৫। প্রথমে মোট যে ৩৮৯ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান সভা গঠিত হয়, তার জন্য কতজন মুসলিম লিগের প্রতিনিধি ছিলেন?

১৬। ভারতের সংবিধানে একক নাগরিকত্বের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে কোন দেশের সংবিধান থেকে?

১৭। সংবিধানের কোন তপশিল-এ কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে?

১৮। রাজ্যের আইনি কাজকর্মের ক্ষেত্রে শীর্ষ আধিকারিক কে?

১৯। কোন মৌলিক অধিকারটিকে ড. আম্বেডকর 'heart and soul of the Constitution' বলে বর্ণনা করেছিলেন?

২০। কোন ধারার আওতায় সরকার 'ভারতরত্ন' ও 'পদ্মশ্রী' ইত্যাদি সম্মান চালু করে?

২১। কোন লেখটিকে 'bulwork of personal fredo' বলে বর্ণনা করা হয়?

২২। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সংবিধানের কোন খণ্ডে রয়েছে?

২৩। কত-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে মৌলিক অধিকারের থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল?

২৪। সংসদের অনুমোদন না পেলে, জাতীয় জরুরি অবস্থা, ঘোষণার কত দিন পর পর্যন্ত বহাল থাকতে পারে?

২৫। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষমতা সংবিধানে কয়টি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তর :

১. ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ২. ড. বি. আর. আম্বেডকর। ৩. ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ সাল ৪. ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সাল। ৫. গ্রেট ব্রিটেন। ৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৭. ৪২-তম সংশোধনী, ১৯৭৬ সাল। ৮. ভেটো প্রদানের ক্ষমতা। ৯. কেশবানন্দ ভারতী মামলা। ১০. রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ১১. তিন ধরনের। ১২. ২২৬ নং ধারা। ১৩. প্রোহিবিশন। ১৪. সুপ্রিম কোর্টের। ১৫. ৭৩ জন। ১৬. ব্রিটেন। ১৭. সপ্তম তপশিল। ১৮. অ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯. Right to constitutional remedies (৩২ নং ধারা)। ২০. ১৮ নং ধারা। ২১. হেবিয়াস কর্পাস। ২২. চতুর্থ খণ্ড (Part-IV)। ২৩. ৪২-তম সংশোধনী ২৪. একমাস। ২৫. তিনটি।❑

মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমবার ভারত

পুনম যাদবের ভেল্কিতে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানে হারাল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। গত ২১ ফেব্রুয়ারি টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেফালি ভার্মা (২৯), দীপ্তি শর্মা (৪৯) রান পাওয়ায় ভারত ২০ ওভারে করে চার উইকেটে ১৩২ রান। স্মৃতি মান্ধানা করেন মাত্র ১০ রান। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ২ রানের বেশি করতে পারেননি। পুনম যাদবের স্পিনে ভেঙে পড়ে অজিদের ব্যাটিং লাইন আপ। পুনমের গুগলি, ফ্লাইট বুঝতেই পারেননি অজি ব্যাটসম্যানরা। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র হিলি ৫১ রান করেন। পুনমের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। হিলির পাশাপাশি গার্ডনারও (৩৪) রান পান। বাকিরা কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। এদিন হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন পুনম। হেইনস ও পেরিকে পর পর দু'বলে ফেরানোর পরে হ্যাটট্রিক করার সুযোগ এসেছিল তার সামনে। কিন্তু জোনাসেনের সহজ ক্যাচ ফেলে দেন উইকেটকিপার ভাটিয়া। দিনের শেষে পুনমের নামের পাশে লেখা ৪-০৯-৪। শিখা পাণ্ডে নেন ৩-টি উইকেট। অজিদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১১৫ রানে।

প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে ১৮ রানে হারাল ভারত। ১৭ বলে ৩৯ রান করে ম্যাচের সেরা শেফালি বর্মা। ১৪ বলে দু'টি চার মেরে ১৪ রান করে নজর কাড়লেন এই ভারতীয় দলে বাংলার সদস্য রিচা ঘোষ এবং তারই সঙ্গে চলছে পুনম যাদবের স্পিন-ঘূর্ণি। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার উইকেটের পরে এদিনের ম্যাচে তার ঝুলিতে জমা পড়ল তিন উইকেট। গ্রুপ 'এ'-তে টানা দু'ম্যাচ জিতে চার পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল ভারত। পার্থে আয়োজিত এই ম্যাচে টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সালমা খাতুন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান করে ভারত। জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয় ১২৪-৮। জ্বরের কারণে এদিন স্মৃতি মন্ধানা খেলেননি। তাই বাংলার ১৬ বছরের ক্রিকেটার রিচা ঘোষের এদিন বিশ্বকাপ অভিষেক হয়। মন্ধানা না থাকায় তার জায়গায় শেফালির সঙ্গে ওপেন করতে নামে উইকেটকিপার তানিয়া ভাটিয়া। শেফালি ছাড়াও ভারতের পক্ষে ৩৭ বলে উল্লেখযোগ্য ৩৪ রান করেন জেমাইয়া রদ্রিগেস। ভারতের ১৪২ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই শামিমা সুলতানার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল বাংলাদেশ। ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে সেই চাপ কাটিয়ে জয় পেতে ব্যর্থ বাংলাদেশের মেয়েরা। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ১৮ রানে তিন উইকেট নেন পুনম যাদব। সফল শিখা পাণ্ডে (২-১৪) ও অরুন্ধতী রেড্ডিও (২-৩৩)।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৩ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীতরা পৌঁছে গেলেন টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে। এ নিয়ে বিশ্বকাপে টানা তিনটি ম্যাচ জিতল ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিলেন স্মৃতি মান্ধানা-শেফালি ভার্মারা। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার পরে তৃতীয় ম্যাচেও ভারতের দাপট চলল। টস জিতে এদিন ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। ২০ ওভারে ভারত তোলে আট উইকেটে ১৩৩ রান। প্রথম দুই ম্যাচের মতো কিউয়িদের বিরুদ্ধেও রান পেলেন ওপেনার শেফালি ভার্মা। এদিন ৩৪ বলে ৪৬ রান করেন তিনি। তার ইনিংসে সাজানো ছিল ৪-টি চার ও ৩-টি ছক্কা। শেফালি রান পেলেও মান্ধানা এদিন ১১ রান করেন। তিন নম্বরে নামা তানিয়া ভাটিয়া ২৫ বলে ২৩ রানের বেশি করতে পারেননি। মিডল অর্ডারও রান পায়নি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এদিনও ব্যর্থ। ব্যাটসম্যানরা ভালো রান না পাওয়ায় ভারত তোলে আট উইকেটে ১৩৩ রান। টি-২০-র নিরিখে বিচার করলে এই রান খুব একটা বেশি নয়। কিউয়িদের হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে আনতে হলে শুরু থেকে উইকেট তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা খোলা ছিল না ভারতের সামনে। সেই কাজটাই করেন শিখা পাণ্ডে, পুনম যাদবরা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলতে থাকেন তারা। দুই কিউয়ি ওপেনার প্রিস্ট (১২) ও ডিভাইন (১৪) শুরুটা ভালো করতে পারেননি। তিন নম্বরে নামা বেটস করেন মাত্র ৬ রান। পরের দিকে গ্রিন (২৪), মার্টিন (২৫) ও অ্যামেলিয়া কের (৩৪ অপরাজিত) রান পেলেও তা জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না। শেষ ওভারে জেতার জন্য ১৬ রান দরকার ছিল কিউয়িদের। হরমনপ্রীত বল তুলে দেন শিখা পাণ্ডের হাতে। প্রথম বলেই তাকে বাউন্ডারি মারেন জেনসেন। শিখার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে এক রান করে নেন কিউয়ি ব্যাটসম্যানরা। শেষ দু' বলে কিউয়িদের দরকার ছিল ৯ রান।

পাণ্ডের পঞ্চম বলে ফের বাউন্ডারি হাঁকান। কিন্তু শেষ বলে রান আউট হন জেনসেন। শেষ ওভারেই উত্তেজনার যাবতীয় মশলা নিয়ে হাজির হয়েছিল ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে কিউয়িরা তোলে ছ' উইকেটে ১৩০ রান। টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ এ-তে ভারত এখন ছয় পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে। হরমনপ্রীতদের শেষ চারে ওঠার কোনও বাধা থাকেনি আর। টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসাবে এদিনই শেষ চারে গেল ভারত।

এই প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র পেলেন ভারতের মেয়েরা। কিন্তু এইভাবে যে ফাইনালের টিকিট আসবে, তা সম্ভবত চাননি কেউই। গত ৫ মার্চ সিডনিতে বৃষ্টির জন্য ভারত বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচে একটা বলও হয়নি। কিন্তু গ্রুপ লিগে শীর্ষে থাকার কারণে ফাইনালে চলে গেল ভারত। ৮ মার্চের মহারণে হরমনপ্রীতদের সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। যাদের অবশ্য গ্রুপ পর্যায়ে হারিয়েছে ভারত। দুরন্ত ফর্মে থাকা ভারত সহজেই গ্রুপে তাদের চারটে ম্যাচ জিতেছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ড হেরে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। গ্রুপ লিগে এই একটামাত্র ম্যাচ হারার জেরে ছিটকে যেতে হল ইংল্যান্ডকে। এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয় সিডনিতে। যে কারণে টস পর্যন্ত হতে পারেনি। শেষপর্যন্ত আম্পায়াররা ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালে যায় অস্ট্রেলিয়া।

মেলবোর্নে টি-২০ বিশ্বকাপে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চার উইকেটে ১৮৪ তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফলে, বিশ্বকাপ জিততে ভারতের দরকার ছিল ১৮৫। কিন্তু, হরমনপ্রীত কৌরের দল ১৯.১ ওভারে থেমে গেল মাত্র ৯৯ রানে। কোনও লড়াই করতেই পারল না ভারত। অস্ট্রেলিয়া জিতল ৮৫ রানে। তিন বছর আগে লর্ডসের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতীয় মেয়েদের। ইংল্যান্ডের কাছে হেরে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল মিতালি রাজ-হরমনপ্রীত কৌরদের। এবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালেও তার পুনরাবৃত্তি হল।

উল্লেখ্য, মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ভাঙল সব রেকর্ড। এর আগে মহিলাদের ক্রিকেট নিয়ে এমন উন্মাদনা দেখা যায়নি। টিভি ও ডিজিটাল দুনিয়ায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করল এই বিশ্বকাপ। ফাইনালের আগে পর্যন্ত বিশ্বকাপের ৭০ কোটিরও বেশি ভিডিও দেখেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এর আগে ২০১৭ সালে মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে মোট ১০ কোটি ভিডিও দেখেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। প্রতিযোগিতার সরকারি সোশ্যাল চ্যানেলে হয়েছে তিন কোটি ৪০ লক্ষ এনগেজমেন্ট। মোট ১৬০-টি দেশের সরাসরি দেখানো হয় মহিলাদের বিশ্বকাপ। সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও দেখানো হচ্ছে হাইলাইটস। উদ্বোধনী ম্যাচে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার লড়াই সব ধরনের প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে দেখেছেন প্রায় ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার দর্শক। অস্ট্রেলিয়াতে মহিলাদের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি দর্শকের তালিকায় এটা দ্বিতীয়। ভারতে এই ম্যাচ দেখেছিলেন দু'কোটি দর্শক। ভারতে সামগ্রিকভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচের দর্শক সংখ্যা অনেক বেড়েছে।❑

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯

যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে এবং এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ (অতঃপর এটিকে মূল আইন হিসাবে উল্লেখ করা হবে)-এর অনুচ্ছেদ ২-এর উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর ধারা (বি)-তে নিম্নলিখিত অনুবিধি যোগ করা হবে। যাতে বলা হয়েছে, ''আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে আগত কোনও ব্যক্তি, তা তিনি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিষ্টান যে সম্প্রদায়ভুক্তই হন না কেন, যদি ২০১৪ সালের ৩২ ডিসেম্বরের আগে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে থাকেন; তথা পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০-র অনুচ্ছেদ ৩-এর উপ-অনুচ্ছেদ (২)-এর ধারা ৩-এর আওতায় অথবা বিদেশি আইন, ১৯৪৬-এর অন্তর্গত আবেদনপত্রের সংস্থান অনুযায়ী, তথা উক্ত আইনবিধির আওতায় প্রণীত কোনও নিয়ম বা আদেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য হয়ে থাকেন তবে তাকে এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত অবৈধ অভিবাসী হিসাবে গণ্য করা হবে না''।

মূল আইনের ৬এ অনুচ্ছেদের পরে ৬বি বলে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

(১) কেন্দ্রীয় সরকার বা উক্ত নিমিত্তে তার দ্বারা বিনির্দিষ্ট কোনও কর্তৃপক্ষ, অনুচ্ছেদ ২-এর উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীন ধারা (বি)-তে উল্লিখিত সংস্থান অনুযায়ী, যথাবিহিত কিছু শর্ত, নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি সাপেক্ষে সেই মর্মে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে নিবন্ধন শংসাপত্র বা নাগরিকত্ব অর্পণ শংসাপত্র প্রদান করতে পারে।

(২) অনুচ্ছেদ ৫-এ বিনির্দিষ্ট শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অথবা তৃতীয় তপশিলের আওতায় প্রদত্ত সংস্থানে উল্লেখিত নাগরিকত্ব অর্পণের যোগ্যতাবলীর ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তিকে নিবন্ধনপত্র/নাগরিকত্ব অর্পণ শংসাপত্র প্রদান করা হবে উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর আওতায়। এবং সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের তারিখ থেকেই এদেশের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে।

(৩) নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ বলবৎ হওয়ার দিনটি থেকেই এই ধারার আওতায় কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ অভিবাসন বা নাগরিকত্ব বিষয়ক কোনও কার্যাবলী বকেয়া থেকে গেলে, নাগরিকত্ব প্রদান না করা পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকা হবে। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। তার বিরুদ্ধে যে আইনি কার্যাবলী বকেয়া আছে, তার জেরে এই ধারার আওতায় উক্ত ব্যক্তি যেন নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের অনুপযুক্ত বলে গণ্য না হন। বাদবাকি সব নিরিখে এই ধারার আওতায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হলে কেন্দ্রীয় সরকার বা তার দ্বারা নিয়োজিত পূর্বোক্ত বিনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, উভয়ের মধ্যে কেউই বকেয়া আইনি কার্যকলাপের বাহানায় উক্ত ব্যক্তির আবেদনপত্র বাতিল করতে পারবে না। এছাড়াও নাগরিকত্ব লাভের জন্য এই ধারার আওতায় যে ব্যক্তি আবেদন করবেন, আবেদনপত্র দাখিলের সুবাদে, আবেদনপত্র জমা করার তারিখটি থেকেই যেসব অধিকার এবং সুযোগসুবিধার তিনি হকদার, সেসব থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(৪) এই ধারার কোনও অংশই অসম, মেঘালয়, মিজোরাম বা ত্রিপুরাস্থিত সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না। Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873-এর আওতায় প্রজ্ঞাপিত ''The Inner Line'' এলাকাভুক্ত স্থানগুলির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য নয়।

মূল আইনের ৭ডি অনুচ্ছেদে; (১) ধারা(ডি)-এর পরে যুক্ত করা হয়েছে আরেকটি ধারা (ডিএ)। বলা হয়েছে বিদেশে বসবাসকারী OCI কার্ডধারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা যদি এই মূল আইনের কোনও শর্ত/অনুবিধি অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অফিশিয়াল গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিপত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা আপাতত বলবৎ অন্য যেকোনও আইনকানুনের শর্তাদি লঙ্ঘন করে থাকেন; তবে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯-এর আওতায় (২) ধারা (এফ)-এর পরে নিম্নলিখিত শর্ত যুক্ত করা হবে। OCI কার্ডধারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুরোদস্তুর সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদের আওতায় কোনও অর্ডার জারি করা হবে না।

মূল আইনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে উপ-অনুচ্ছেদ (২)-এর ধারা(ইই)-এর পরে আরেকটি ধারা(ইইআই) জোড়া হবে। এটি হচ্ছে, অনুচ্ছেদ (৬বি)-এর উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর আওতায় নিবন্ধনপত্র/নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রদানের শর্ত, বিধিনিয়ম এবং পদ্ধতি। অনুচ্ছেদ ২ সংশোধন। ১৮৭৩-এর ৫, ১৯২০-র ৩৪, ১৯৪৬-এর ৩১ বিষয়ক। নতুন অনুচ্ছেদ ৬বি সংযোজন। অনুচ্ছেদ ২-এর উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর ধারা (বি)-এর শর্তাদি পূরণ সূত্রে কোনও ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিশেষ সুযোগ। ৭ডি অনুচ্ছেদের সংশোধন। ১৯৫৫-র ১৮.৫৭ অনুচ্ছেদের সংশোধনী। গেজেট অফ ইন্ডিয়া এক্সট্রাঅর্ডিনারি (পার্ট ২-৬ নং)। মূল আইনের তৃতীয় তপশিলের ধারা(ডি)-তে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছে। বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস/সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত থাকার সময় এই ধারার আওতায় ''এগারো বছরের থেকে কম নয়''-এর পরিবর্তে ''পাঁচ বছরের কম নয়'' বলে পড়তে হবে।❑

তথ্যসূত্র : The Gazette of India (http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214646.pdf).

যোজনা ডায়েরি

(মার্চ ২০২০)

আন্তর্জাতিক

● **করোনাকে 'অতিমারী' ঘোষণা করল হু :**

অ্যান্টার্কটিকা বাদে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে ছ'টি মহাদেশেই। আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থার পর এবার করোনার সংক্রমণকে প্যানডেমিক বা 'অতিমারী' (মহামারীর চেয়েও ভয়াবহ) ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। গত ১১ মার্চ এই ঘোষণা করে করোনার সংক্রমণকে 'অভূতপূর্ব' বলেছেন হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস আধানম ঘেব্রিয়েসাস।

জানুয়ারিতে 'আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কিন্তু তারপর থেকে হু হু করে বেড়েছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা। তখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে মৃত্যু হয় চার হাজারেরও বেশি মানুষ, আক্রান্ত প্রায় ১২ হাজার, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ছাড়া প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ, এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসকে 'অতিমারী' ঘোষণা করে হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল ঘেব্রিয়েসাস এদিন বলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আগে কখনও এত অতিমারীর আকারে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়নি। একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে এই অতিমারী নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। পরিস্থিতিকে অতিমারী ঘোষণা করার পাশাপাশি করোনার বিপদ নিয়ে হু তার অবস্থান পরিবর্তন করছে না। রোগ মোকাবিলায় হু এবং দেশগুলির যা করণীয়, তা করা হচ্ছে।

অতিমারী ঘোষণার পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় কী কী করতে হবে, তা নিয়ে আগের পরামর্শগুলি ফের জানিয়েছেন ঘেব্রিয়েস। তার পরামর্শ, কোনও দেশে করোনা সংক্রমণের সন্দেহ হলে আগে কোয়ারেন্টাইন বা আলাদা করে রেখে পরীক্ষা করতে হবে। কারও শরীরে ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তার সংস্পর্শে যারা যারা এসেছেন, তাদেরও পরীক্ষা ও আলাদা করার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ব্যাপক আকারে ছড়ালে ক্লাস্টার বা একসঙ্গে অনেককে আলাদা করে রেখেও করোনার মোকাবিলা করা যেতে পারে, বলেছেন ঘেব্রিয়েস।

● **মোকাবিলাতেও ভারতের উপরই আস্থা হু-র :**

পোলিয়ো এবং গুটি বসন্তের মতো অতিমারি কাটিয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতের। তাই নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তারাই পথ দেখাতে পারে বলে মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মাইকেল জে. রায়ানের। কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে গত ২৪ মার্চ সাংবাদিক বৈঠক করেন মাইকেল জে. রায়ান। তিনি বলেন, ভারত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ; যেখানে জনবসতি বেশি, সেখানেই এই ভাইরাসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হওয়া সম্ভব; তবে যেখানে প্রকোপ বেশি, সেই সমস্ত জায়গায় ল্যাবের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। হু-র কর্তাদের মতে, কোভিড-১৯ ভাইরাসটি ক্রমশ সংক্রমণের গতি বাড়াচ্ছে। তিনি আরও বলেন, গুটি বসন্ত এবং পোলিয়োর মতো দু'টি অতিমারি কাটিয়ে উঠতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে ভারত; তাই এই ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের।

● **করোনা রুখতে সার্কের ভিডিয়ো কনফারেন্স :**

করোনা মোকাবিলার কৌশল বের করতে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মতামত বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তা সমর্থন করেছিল পাকিস্তানের ইমরান খান সরকারও। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গত ১৫ মার্চ করোনা ঠেকাতে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মতের আদান-প্রদান করল দক্ষিণ এশিয়ার ওই মঞ্চটির এক্তিয়ারে থাকা দেশগুলি। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে, রোগ ঠেকাতে একজোট হয়ে, উপযুক্ত পদক্ষেপ করার বার্তা দেন মোদী। সার্কের নেতাদের বলেন, ভয় পাবেন না, রোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। সেই সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র 'অতিমারী' তকমা দেওয়া ওই রোগ ঠেকাতে ভারত কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, করোনা ভাইরাস যাতে থরহরিকম্প তৈরি করতে না পারে সেব্যাপারে আমরা সাবধানী ছিলাম; আমরা ওই ভাইরাসের প্রকোপ রুখতে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ করে চলেছি; ধাপে ধাপে নানা পদক্ষেপই এর আতঙ্ক মুছে দিতে আমাদের সাহায্য করেছে। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, গোটা দেশ জুড়েই করোনা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার শুরু হয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কাজও চলছে।

মোদী আরও বলেন, এই অতিমারী রুখতে প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্ক্রিনিং, সংক্রমণ খুঁজে বের করা, কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশন পরিষেবা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার বিষয়টিও।

করোনা প্রতিরোধে সার্কের দেশগুলিকে একটি জরুরি তহবিল গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এজন্য ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ৭৩ কোটি টাকার বেশি অনুদান দিতে চান তিনি। করোনা পরিস্থিতি সামলাতে ওই মঞ্চের দেশগুলির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মোদী। আগামী পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা একটি র‍্যাপিড রেসপন্স টিম তৈরি করছি; তাতে

চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞরা থাকবেন; থাকবে পরীক্ষার কীট, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামও; আপনাদের প্রয়োজন পড়লে তাদের পাঠানো হবে। এ নিয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণের প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। সকলে এক জোট হয়ে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে গবেষণা চালানোর প্রস্তাবও দেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এটাই প্রথম বা এটাই শেষ মহামারী নয়।

এদিনের ভিডিয়ো কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মহম্মদ সলিহ, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানিও। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে করোনার চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন আফগান প্রেসিডেন্ট। এব্যাপারে দূরশিক্ষার জন্য ভারতের সাহায্যও চান তিনি। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান মোদীর এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেও নিজে কনফারেন্সে আসেননি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। ছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা অলি ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিংও।

পৃথিবী জুড়ে যখন প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত, মৃত্যু হয়েছে ৫ হাজার সাতশো জনেরও বেশি মানুষের, পরিস্থিতির কথা বিচার করে, এদিন সার্ক গোষ্ঠীর দেশগুলিকে এক জোট হয়ে, করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর বার্তা দিয়ে রাখলেন মোদী।

● **ঋষি সুনকের প্রথম বাজেট :**

প্রথমবার বাজেট পেশ করে যথষ্ট নজর কেড়েছেন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী এবং ইনফোসিস প্রতিষ্ঠাতা এন. আর. নারায়ণমূর্তির জামাই ঋষি সুনক। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মন্ত্রী লম্বা সময়ের জন্য দেওয়া ব্রিটিশ ভিসাকে আরও দুর্মূল্য করার কথা গত ১২ মার্চ ঘোষণা করেছেন। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের ভিসায় বাথ্যতামূলক যে 'হেল্‌থ ফি' দিতে হয়, তা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন ঋষি। সারচার্জ আগেও ছিল। ঋষি জানিয়েছেন, 'ইমিগ্রেশন হেল্‌থ সারচার্জ' (আইএইচএস) বছরে ৪০০ পাউন্ড থেকে ৬২৪ পাউন্ড করা হয়েছে। ৩৯ বছর বয়সি মন্ত্রীর কথায়, অভিবাসীরা আইএইচএস থেকে উপকৃত হন। কিন্তু মানুষ যতটা উপকৃত হন, সেই অনুপাতে মূল্য দিতে হ'ত না। তাই ইস্তাহারে যেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেইমতো আইএইচএস বাড়িয়ে ৬২৪ পাউন্ড করা হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে।

● **করোনা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ জি-২০ :**

করোনায় ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একসঙ্গে লড়াইয়ে সংকল্প উঠে এল জি-২০ দেশগুলির ভিডিয়ো সম্মেলনে। বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সম্মিলিতভাবে ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থ ঢালবে তারা এবং সেই প্রয়াস সার্থক করতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব। গত ২৬ মার্চ বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেহাল বিশ্ব অর্থনীতির হাল ফেরাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করা হবে। জি-২০-র অধীনে সমস্ত তহবিলকে আরও শক্তিশালী করে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে। বিনা বাধায় যাতে দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতে পারে, তাতে জোর দেওয়া হবে। মানুষের জীবিকায় যাতে সংকট তৈরি না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশগুলির অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে বৃদ্ধির পথে ফেরাতে হবে। এদিন রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানান, জি-২০-র পক্ষ থেকে অবিলম্বে বড়ো অঙ্কের সহায়তা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতি, কর্মী এবং ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার সিদ্ধান নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে জানান, এতদিন পর্যন্ত জি-২০ বিভিন্ন দেশগুলির বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আন্তঃবাণিজ্যিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে সামাজিক ও মানবিক দিককে সামনে এনে সহযোগিতা বাড়ানোর। করোনা ভাইরাসের এই চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগানোর ডাক দিয়েছেন মোদী বিশ্বের নেতাদের সামনে। করোনার টিকা তৈরি থেকে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোথাও যেন বাধা না তৈরি হয়, সেদিকেও জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এব্যাপারে কোনও একটি দেশের গবেষণা যাতে সহজেই এবং দ্রুত অন্য দেশে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে জি-২০ রাষ্ট্রগুলির কাছে আহ্বান জানান নরেন্দ্র মোদী।

● **রাষ্ট্রপুঞ্জের 'দ্য কোভিড-১৯ শক টু ডেভলপিং কান্ট্রিজ' রিপোর্ট :**

করোনা ভাইসার সংক্রমণের জেরে যা মনে করা হচ্ছিল, তার চেয়েও বড়ো মন্দা আসতে চলেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। তবে এই বিরাট ধাক্কা থেকে বাদ পড়তে পারে ভারত ও চিনের অর্থনীতি। রাষ্ট্রপুঞ্জের কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি)-র নয়া বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এই তথ্য। মন্দার কোপে সবচেয়ে বেশি পড়বে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতি, বলা হয়েছে সমীক্ষায়। সব মিলিয়ে ক্ষতি হতে পারে ২ থেকে ৩ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। তার জন্য উন্নয়নশীল সব দেশ মিলিয়ে অন্তত আড়াই লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করা দরকার বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে নতুন এই সমীক্ষায়।

'দ্য কোভিড-১৯ শক টু ডেভলপিং কান্ট্রিজ' নামে রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক মন্দার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েব। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ বছর লাখ লাখ কোটি ডলারের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। চিন ও ভারত বাদে এটা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে মারাত্মক হবে। কী কারণে চিন এবং ভারতে প্রভাব কম পড়বে, সেবিষয়ে স্পষ্ট করা হয়নি ওই সমীক্ষায়।

এর কিছু দিন আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছিল, উন্নত ২০-টি দেশ (জি-২০) মিলে মোট ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে নতুন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলায় অভূতপূর্ব এই সাড়া অর্থনীতির এই ধাক্কাকে বস্তুগত ও মানসিক দিক থেকে সাময়িকভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে। তবে নতুন সমীক্ষায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, এখনও এইসব পুনরুজ্জীবন বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। জানা সম্ভব হলে চিত্রটা আরও স্পষ্ট হবে।

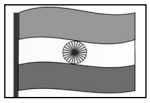

জাতীয়

➢ মধ্যপ্রদেশে কুর্সিবদল হয়ে গেল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গত ২৩ মার্চ রাতেই চতুর্থবারের জন্য শপথ নেন শিবরাজ সিং চৌহান। আর

পরের দিন সকালে বিধানসভায় আস্থা ভোটেও জয়ী হলেন তিনি। আস্থা ভোটে জয়ী হওয়ার জন্য ১০৪ বিধায়কের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল শিবরাজ সিং চৌহানের। এদিন ভোটাভুটিতে সব মিলিয়ে ১১২ জন বিধায়কের সমর্থনে জয়ী হন তিনি। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের বিধায়কদের বিদ্রোহের জেরে এর আগের সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কমলনাথ।

● **কৃষি ঋণ প্রসঙ্গে :**

দেশে কৃষকদের মাথাপিছু আয় বছরে ৭৭ হাজার টাকার সামান্য বেশি। কিন্তু কৃষকদের পরিবারপিছু ঋণের বোঝার পরিমাণ ৪৭ হাজার টাকা। কৃষিমন্ত্রক গত ৪ মার্চ সংসদে জানিয়েছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৫২ শতাংশ কৃষক পরিবারই ঋণগ্রস্ত।

কেন্দ্র সরকার চাষিদের জন্য বছরে ছয় হাজার টাকা ভাতার পিএম-কিষান প্রকল্প চালু করেছে। সাংসদ দীপক অধিকারীর প্রশ্নের উত্তেরে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানান, চাষিদের ঋণের বোঝা কমাতে সরকার সুদে ভরতুকি দিচ্ছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা অন্য জায়গা থেকে স্বল্পমেয়াদে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ ঠিক সময়ে মিটিয়ে দিলে সুদের হার ৭ থেকে ৪ শতাংশে নেমে আসে।

কৃষিমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে চাষি পরিবারের গড় ঋণের পরিমাণ ১৪ হাজার ৮৪৮ টাকা। অর্থাৎ জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ কম। কেরলে চাষিদের ঋণের পরিমাণ সব থেকে বেশি, পরিবারপিছু ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার বেশি। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও এই ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বেশি। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলিতেও চাষিদের পরিবারপিছু ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। ২০১৯-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা।

● **নৌসেনার মহিলাদের স্থায়ী কমিশনে সায় কোর্টের :**

স্থলসেনার পরে এবার নৌসেনার মহিলা অফিসারদেরও স্থায়ী কমিশনের পক্ষে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, দেশের কাজে নিয়োজিত মহিলাদের এই অধিকার না দিলে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে মহিলা অফিসারেরা অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত নৌসেনায় কাজে বহাল থাকতে পারবেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কাজ করতে হবে না তাদের। রায়ের তিন মাসের মধ্যে এ নিয়ে পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি ডি. এয়াই. চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ গত ১৮ মার্চ বলেছে, সামরিক বাহিনীতে লিঙ্গবৈষম্য শেষ করার প্রশ্নে কোনও ধরনের অজুহাত চলতে পারে না। তিন মাসের মধ্যে স্থায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে নৌসেনার মহিলা অফিসারদের নিয়োগ হয় শর্ট সার্ভিস কমিশনে। ১০ বছরের জন্য কাজ করতে পারেন তারা। এই মেয়াদ আহও চার বছর বাড়ানো যায়। অর্থাৎ কাজের মেয়াদ কার্যত ১৪ বছরের জন্য। এবার তা বাড়িয়ে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

● **নারী দিবস উপলক্ষ্যে :**

কেউ অর্ধাহারী-অনাহারীদের মুখে খাবার তুলে দিয়ে খাদ্য বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কেউ বোমা বিস্ফোরণে হাত উড়ে যাওয়ার পরেও হতোদ্যম হননি। আবার কেউ মহিলাদের কর্মসংস্থানে দেখিয়েছেন নয়া দিশা। পরিবেশ রক্ষায় গোটা সমাজকে বদলে ফেলেছেন কোনও বৃদ্ধা। জীবন ও সমাজ পাল্টানোর যুদ্ধে নজির গড়া এমনই সাত মহিলাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট উৎসর্গ করলেন এই মহিলাদের লড়াই-সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরার জন্য। নারী দিবসে তার ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রামে সেই সাত নারীর গল্প। 'শিইন্সপায়ার্সআস' হ্যাশট্যাগে প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ভিডিয়োর মাধ্যমে শেয়ার করা হয়েছে, জীবনকে অন্যভাবে দেখা সাত নারীর কথা।

তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের তরুণী স্নেহা মোহাদস। গরিবদের জন্য 'ফুডব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া' গড়ে তোলা এই নারীর কেন এমন ভাবনা, কীভাবে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন অভাবী-অসহায় মানুষের জন্য খাদ্যভাণ্ডার এবং বিনা পয়সায় তাদের মধ্যে বিলি করছেন, সেই কাহিনী শেয়ার করেছেন ভিডিও বার্তায়। বলেছেন, প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ খাবার রান্না করেন স্বেচ্ছাসেবকরা; সেই খাবার প্যাকেটবন্দি করে পৌঁছে দেন সহায়-সম্বলহীন মানুষের কাছে। স্নেহা জানিয়েছেন, তারা কোনও নগদ টাকা ডোনেশন নেন না। চাল, ডাল, তেল, নুন, সব্জি, যার যা ইচ্ছা তাই দেন। তাই দিয়েই প্রতিদিন কয়েকশো মানুষের খাবারের সংস্থান করেন স্নেহা।

বয়স তখন মাত্র ১৩। সেই কিশোরী বয়সেই রাজস্থানের বিকানেরে বোমা বিস্ফোরণে নিজের দু'টো হাতেরই প্রায় কনুই পর্যন্ত খুইয়েছিলেন মালবিকা আইয়ার। পায়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন। চোখও অন্ধ হতে বসেছিল। তবে চিকিৎসকদের চেষ্টায় পা ও চোখের বড়ো ক্ষতি হয়নি। হাত দু'টো হারালেও হারাননি ইচ্ছাশক্তি। আর সেই অদম্য শক্তির জেরেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন। তাক লাগানো ফল করে ডক্টরেট হয়েছেন। পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও।

মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারের কারণে ক্রমাগত কমেই চলেছে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ। আগামী প্রজন্মের জন্য তাই অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে জল সংরক্ষণ। সেহ ক্ষেত্রেই নয়া দিশা দেখিয়েছেন হায়দরাবাদের আর্কিটেক্ট কল্পনা রমেশ। নিজের বাড়িতেই এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও নষ্ট না হয়। সেই জল শুধু নিজে নয়, সরবরাহ করছেন আশপাশের বাড়িগুলিতেও।

শ্রীনগরের আরিফার স্বপ্ন ছিল নারী ক্ষমতায়ন। আর সেটা করতে গেলে তাদের যে স্বনির্ভর করতে হবে, সেটা বুঝেছিলেন। পশম ও উল দিয়ে কার্পেট, শাল-সহ নানা সামগ্রী তৈরি করা শিখিয়েছেন স্থানীয় মহিলাদের। মহারাষ্ট্রের এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা বিজয়া পওয়ার। বানজারা সম্প্রদায়ের এই মহিলাও মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। মা-ঠাকুমারা এই হস্তশিল্পের কাজ করতেন। তাদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়েই শিখেছিলেন হস্তশিল্পের কাজ। ঘরোয়া সেই কুটিরশিল্পকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছেন বিজয়া। গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিখিয়েছেন মহিলাদের। দেখিয়েছেন রোজগারের পথ।

কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুরু করেছিলেন 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরের বৃদ্ধা কলাবতী দেবী। তার কথায়, খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করার খারাপ দিকগুলি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রথম দিকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেননি। তবু হাল ছাড়েননি কলাবতী দেবী। দু'-আড়াই বছর ধরে একইভাবে বুঝিয়ে গিয়েছেন পাড়া প্রতিবেশীদের। তারপর যখন তারা বুঝেছেন, তখন সেই লোকগুলিই বৃদ্ধার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলেছেন নির্মল এলাকা।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ করোনাভাইরাস নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ফালাকাটায় বিধানসভা উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল শাসক-বিরোধী দুই শিবিরই। নেতাদের কথায়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ছিল। গত অক্টোবর মাসের শেষে প্রয়াত হন ফালাকাটার তৃণমূল বিধায়ক অনিল অধিকারী। যার জেরে ফালাকাটয় উপ-নির্বাচন আসন্ন হয়ে পড়ে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই ফালাকাটা কেন্দ্রে বিজেপি-র থেকে প্রায় ২৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল।

● **তফশিলি প্রবীণদের ভাতা :**

কন্যাশ্রী-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এবার তফসিলি জাতি ও জনজাতির প্রবীণদের জন্য বার্ধক্য ভাতা নিয়ে তারা বড়ো সিদ্ধান্ত নিল। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কী মর্মে তফসিলি জাতি ও জনজাতির প্রবীণেরা বার্ধক্য ভাতা পাবেন, ইতোমধ্যেই রাজ্যের সব জেলা প্রশাসনকে তা জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। ৬০ বছর বয়স হলেই তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত মানুষেরা মাসিক এক হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতা পাবেন। এছাড়াও যারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের অধীনে বার্ধক্য ভাতা বা সমগোত্রীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, তাদের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে জাতি ও জনজাতিভুক্ত মানুষজন ছাড়াও সামগ্রিকভাবে প্রবীণ ব্যক্তিরা ৬০ বছর বয়স হলেই ৬০০ থেকে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, তাদের সেই ভাতার অঙ্ক এক হাজার টাকা করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ দেবে রাজ্য সরকার। এমনকী পরিবারে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের একাধিক সদস্য থাকলে তাদের প্রত্যেকেই সেই সুবিধা পাবেন। অর্থ দপ্তরের অধীনে পৃথক ডিজিটাল মাধ্যম তৈরি করা হবে। সেখানে উপভোক্তারা আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত লোকজন-সহ সামগ্রিক উপভোক্তার সংখ্যা জেলা-পিছু কমবেশি এক লক্ষ হবে বলে মনে বলছেন প্রশাসনিক কর্তারা। গত ১১ মার্চের নির্দেশিকার পরে এই মর্মে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন জেলাশাসকেরা।

● **নিখরচার নেট ব্যবহারের শীর্ষে হাওড়া-শিয়ালদহ :**

বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব স্টেশনকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে হাওড়া ও শিয়ালদহ। জানুয়ারিতে রেলের তথ্য-প্রযুক্তি ও দূরসঞ্চার পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা রেলটেল-এর প্রকাশিত তথ্যের নিরিখে হাওড়া স্টেশনে মাসে চার লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি মানুষ ওয়াইফাই পরিষেবা ব্যবহার করেছেন। আর শিয়ালদহে ওই পরিষেবা ব্যবহার করেছেন চার লক্ষ ৫৩ হাজার যাত্রী। সর্বভারতীয় মাপকাঠিতে ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিয়ালদহের চেয়ে এগিয়ে আছে সেকেন্দ্রাবাদ। সেখানে মাসে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা হাওড়া-শিয়ালদহের চেয়ে গড়ে এক লক্ষ কম। তালিকায় পরের দিকে আছে পাটনা, কল্যাণ, দিল্লি, চেন্নাই সেন্ট্রাল ও ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস।

স্টেশন	ব্যবহারকারী*
■ হাওড়া	৪,৭২,০০০
■ শিয়ালদহ	৪,৫৩,০০০
■ আসানসোল	১,২২,০০০
■ খড়্গপুর	৭১,০০০
■ কলকাতা	৫০,০০০
*গত জানুয়ারির হিসেব	

এরাজ্যে হাওড়া-শিয়ালদহ ছাড়া বিনামূলের ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে আসানসোল ও খড়্গপুর স্টেশন। শহরতলির বিভিন্ন স্টেশনের মধ্য নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বারাসত, সোনারপুরে যাত্রীদের ওই পরিষেবা ব্যবহারে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছে। সেই তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বর্ধমান, দুর্গাপুর বা বোলপুরের মতো স্টেশন। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং বা ঘুম স্টেশনে যাত্রীদের ওয়াইফাই ব্যবহারের প্রবণতা আবার দিঘার তুলনায় বেশি। কলকাতা স্টেশনে সম্প্রতি দূরপাল্লার ট্রেনের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় ওই স্টেশনেও ওয়াইফাই ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা থেকে যাত্রীদের রেল ভ্রমণের ধরণ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহের সম্পর্কে ধারণা মেলে বলে জানাচ্ছেন রেলকর্তারা। হাওড়া-শিয়ালদহের মতো স্টেশনে যাত্রীরা বিনোদন ছাড়াও নানা পরিষেবা খোঁজেন। দার্জিলিং বা ঘুমে আবহাওয়া ছাড়াও স্থানীয় ভূগোল ও পর্যটনস্থলের খোঁজ নেওয়া হয়। যান এবং বাস পরিষেবা নিয়েও খোঁজ করার প্রবণতা রয়েছে।

যাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা থেকে উৎসাহী হয়ে ভবিষ্যতের জন্য আয়ের দরজা খোলার পথে অনেক দূর এগিয়েছে রেল। শহরতলির লোকাল, দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনে 'কন্টেন্ট অন ডিমান্ড' বা মোবাইলে বিনোদন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে তারা।

রেলটেল সারা দেশে ৫,৬০০-র বেশি স্টেশনে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে। তবে আগামী মে মাসের পর থেকে দেশের প্রথম সারির ৪১৫-টি স্টেশনে ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে গুগল। রেলের সঙ্গে তাদের পাঁচ বছরের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে। রেলটেলের বরিষ্ঠ জনসংযোগ আধিকারিক সুচরিতা প্রধান জানান, ওই স্টেশনগুলিতে ভবিষ্যতে তারাই পরিষেবা দেবেন। খুব দ্রুত দেশের বেশিরভাগ স্টেশনকে এই পরিষেবার আওতায় আনার চেষ্টা করছেন তারা।

● **স্কুল শিক্ষক নিয়োগে নয়া নিয়ম :**

আর কাউন্সেলিং নয়। স্কুল শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরি হবে শুধু লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ বিভিন্ন ডিগ্রির নম্বরও প্যানেল তৈরির সময় বিবেচিত হবে না। উচ্চ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সব স্তরে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতিতে এভাবেই আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতোমধ্যেই কলকাতা গেজেটে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিক্ষা দপ্তর।

এতদিন লিখিত পরীক্ষায় যারা পাশ করতেন, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র যাচাই করা হ'ত, ইন্টারভিউ হ'ত। তার ভিত্তিতে তৈরি হ'ত 'মেরিট লিস্ট' বা মেধা-তালিকা। সেই মেধা-তালিকার উপরে ভিত্তি করে কাউন্সেলিং হ'ত। সেখানে পছন্দের স্কুলও বেছে নেওয়ার সুযোগ পেতেন হবু শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিবিরের একাংশের মতে, পুরো পদ্ধতি শেষ করতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছিল। নানান জটিলতা তৈরি হচ্ছিল কাউন্সেলিংয়ের সময়েও। সেই প্রক্রিয়া সরল-সহজ করতেই নতুন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। আগে উচ্চ প্রাথমিক, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষকতার জন্য

আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিতে হ'ত। এখন তিনটি স্তরের জন্য তিনটি ভিন্ন পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তার বদলে যদি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে, তাহলে যেকোনও স্তর বা সবস্তরের জন্য একটি পরীক্ষা দিলেই হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে দু'টি ধাপে। শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-কে বিভিন্ন ক্যাটেগলিতে মোট শূন্য পদের সংখ্যা জানাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার থেকে সব চাকরিপ্রার্থীর উত্তরপত্রই তিন বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে এসএসসি।

● **বাংলার ডেয়ারি :**

ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (এনডিডিবি) হাত থেকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আসার পরেও নাম ছিল মাদার ডেয়ারি। এবার সেই নাম বদলে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে মাদার ডেয়ারির নতুন নাম হচ্ছে 'বাংলার ডেয়ারি'। এই 'ব্র্যান্ড' নামে বিক্রি হবে দুধ এবং দুধজাত সব পণ্য। শুধু নাম বদল নয়, সংস্থার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণেও বড়োসড়ো বদল আনা হচ্ছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড নামে একটি সংস্থা গড়া হয়েছে। সেই সংস্থা চলবে কোম্পানি আইন মেনে। এখনকার মাদার ডেয়ারিকে বাংলার ডেয়ারির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের খবর, বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড নামক সংস্থাটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বোর্ডে সরকারি কর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় দু'জন শিল্পপতিরও থাকার কথা। সংস্থার কাজ শুরুর জন্য ১০ কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার।

● **উচ্চশিক্ষা বিলের বিজ্ঞপ্তি :**

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের 'পুলিশ ভেরিফিকেশন' বা পুলিশ দিয়ে প্রার্থীর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া এবং মেডিক্যাল টেস্ট বা স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে এবার গেজেট-বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৭' পেশ করেছিলেন ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতে। তাতে অন্য কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ের সঙ্গে পুলিশি যাচাই এবং স্বাস্থ্যপরীক্ষাও ছিল। বিরোধী সব শিক্ষক সংগঠনই সেই বিলের বিরোধিতা করেছিল তীব্রভাবে। বিলে জানানো হয়েছিল, আগে শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিয়ে তার পরে পুলিশি যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর্ব দু'টি সারা হবে। যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এই দুই পরীক্ষার বাধা ডিঙোতে পারেননি, তাহলে তিনি আর শিক্ষক থাকবেন না।

বিল পাস হয়ে গেলেও গত তিন বছরে পুলিশি যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয় দু'টি বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এবার গেজেট-বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় সেগুলো রূপায়িত হতে যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পুলিশি যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো হবেই। সেইসঙ্গে 'পার্সোনাল অ্যান্টিসিডেন্টস' বা প্রার্থীর বংশপরিচয় খতিয়ে দেখবে পুলিশ। এগুলো কীভাবে করা হবে, সেই বিষয়ে দু'টি ফর্ম জুড়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপিতে। পুলিশি যাচাইয়ের ফর্মে চার নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, শিক্ষকপদের আবেদনকারী যদি আদতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল বা অন্য কোনও দেশের বাসিন্দা হন, তাহলে সেই দেশে তাদের ঠিকানা কী ছিল, তা জানাতে হবে। পাঁচ নম্বর পয়েন্টে জানানো হয়েছে, প্রার্থী গত পাঁচ বছর যেখানে ছিলেন, সেখানকার কথা বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। দশ নম্বর পয়েন্টে জানতে চাওয়া হচ্ছে, প্রার্থী কোন ধর্মাবলম্বী।

অর্থনীতি

- করোনা ভাইরাসের জেরে বিশ্ব অর্থনীতির একটা বড়ো অংশে মন্দা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে বলে জানান রিজার্ভ ব্যাঙ্কও। তবে একই সঙ্গে শীর্ষ ব্যাঙ্কের দাবি, ভারতীয় অর্থনীতির ভিত শক্ত। এমনকী ২০০৮ সালের বিশ্ব জোড়া মন্দার পরবর্তী সময়ের চেয়েও এখন তা বেশি মজবুত। গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের যুক্তি, করোনা অর্থনীতিকে ধাক্কা দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কেটে যাবে।
- চলতি অর্থবর্ষে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। গত ৩ মার্চ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। প্রসঙ্গত, প্রত্যক্ষ করের মধ্যে থাকে আয়কর ও কর্পোরেট কর।
- দেশের আকাশে, দেশীয় উড়ানে বসে ওয়াইফাই মারফত নেট ব্যবহারের প্রস্তাবে গত ২ মার্চ চূড়ান্ত সিলমোহর দেয় বিমান মন্ত্রক। ২০১৮ সালে ইসরোর তৈরি জি-স্যাট ১৪ ব্যবহার করে বহুজাতিক সংস্থা প্যানাসোনিক এই পরিষেবা দিতে শুরু করেছিল। ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাই তাতে অনুমোদন দেয়। ঠিক হয় মাটি থেকে ৩০০০ মিটার উপরে উঠলেই এই সুবিধা পাবেন বিমানে বসা যাত্রী। তবে দেশীয় উড়ানগুলিকে তখন এই অনুমতি দেওয়া হয়নি।
- অনাবাসী ভারতীয়দের (যারা ভারতের নাগরিক) এয়ার ইন্ডিয়ার (এআই) ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি বিধি সংশোধনের পথও খুলে দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এমনিতে ঘরোয়া উড়ানে অনাবাসীদের ১০০ শতাংশ লগ্নির সুযোগ এখনই রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা এআই-এ তা ছিল ৪৯ শতাংশ। এবার সেই বিধিও শিথিল হতে চলেছে। যদিও এর পরেও এআই-এ বিদেশি সংস্থা বা লগ্নিকারীর লগ্নি ৪৯ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।
- সহজে ব্যবসার পরিবেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইনে ৭২-টি বদলের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা। শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগকে যাতে ফৌজদারি মামলা হিসেবে ধার্য করা না হয়, তার জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবও মিলেছে। মিলেছে সামাজিক কল্যাণমূলক দায়বদ্ধতার আইনও সহজ করার প্রস্তাবে সায়।
- ভারতীয় সংস্থা যাতে বিদেশের বাজারে সরাসরি নথিভুক্ত হতে পারে, সেই সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র। এখন কিছু সংস্থা ডিপোজিটরি রিসিটের মাধ্যমে বিদেশের বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে।
- মোবাইল ফোনে জিএসটি বাড়ছে। পয়লা এপ্রিল থেকে মোবাইল ফোন ও তার নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রাংশ কিনতে ১২ শতাংশের বদলে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে।

● **ব্যাঙ্কিং সংশোধনী বিল পেশ :**

বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিল গত ৩ মার্চ লোকসভায় পেশ করল কেন্দ্র। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এতে সায় দিয়েছিল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সংসদে এদিন বিল আনেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তবে তা পাস করানোর চেষ্টা হলেও সেটা সম্ভব হয়নি। সংশোধনীর মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়াই লক্ষ্য সরকারের। তারা চায়, এর মাধ্যমে যাতে ওই ব্যাঙ্কগুলি আরও শক্তিশালী হয়। সহজ হয় মূলধন পাওয়া। আঁটোসাঁটো হয় পরিচালন ব্যবস্থা। কাজে আরও পেশাদারি মনোভাব আসে। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ককে যাতে প্রতারণার মুখে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে চায় কেন্দ্র।

● **নেট-মুদ্রায় সুপ্রিম কোর্টের সায় :**

ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও নিয়ন্ত্রক নেই। অর্থাৎ, ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক একে নিয়ন্ত্রণ করে না। কোনও দেশের সরকার বা শীর্ষ ব্যাঙ্কের দ্বারা স্বীকৃতও নয় এই মুদ্রা। ফলে তা মার গেলে গ্রাহক কোথায় যাবেন তা স্পষ্ট নয়। ২০১৩ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে আমানতকারীদের সতর্ক করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তার পাঁচ বছর পরে নিষেধাজ্ঞা। ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল কারেন্সি ঘিরে বিতর্ক তখন তুঙ্গে। এই অবস্থায় ২০১৮ সালের ৬ এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক নির্দেশিকায় জানায়, তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত কোনও পরিষেবা দিতে পারবে না। গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা তো নয়ই। কিন্তু গত ৪ মার্চ সেই নিষেধাজ্ঞাই খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ। এর ফলে কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান চাইলে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের পরিষেবা দিতে পারবে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানান, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করা হবে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি অনলাইন লেনদেনে ব্যবহারযোগ্য মুদ্রা। আর এক নাম ডিজিটাল কারেন্সি। ব্যবহার হয় সংকেতলিপি বা এনক্রিপশান পদ্ধতিতে। লেনদেনকারীর পরিচয় জানা যায় না। সেই পদ্ধতিতেই তৈরি হয় মুদ্রার ইউনিট। এমনকী তহবিলের লেনদেনও। নানারকম ক্রিপ্টোকারেন্সি আছে। যেমন, বিটকয়েন, লাইটকয়েন, ইথেরিয়াম, রিপ্‌ল, জিক্যাশ, ড্যাশ। ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা যায় সংশ্লিষ্ট মুদ্রার এক্সচেঞ্জ বা কোনও ব্যক্তির থেকে। বিক্রিও হয় সেভাবেই। মোবাইল, কম্পিউটার মারফত। প্রথমে খুলতে হয় ওয়ালেট। একজন একাধিক ওয়ালেটও খুলতে পরেন। ওয়ালেটে এই মুদ্রা জমা থাকে। যা রাখা যায় অনলাইনে, কম্পিউটার, নেট মাধ্যমে 'ভল্ট' বা লকারে। লেনদেন করতে চাইলে ওই জমা ক্রিপ্টোকারেন্সিতেই পাঠাতে হয়। তবে হাতের নেট-মুদ্রা বেরিয়ে গেলে কিন্তু সেটি ফেরত পাওয়ার উপায় নেই। শুধু যার কাছে যাচ্ছে, তিনি ফেরত দিলেই তা সম্ভব। বিশ্বের বেশ কিছু নামী সংস্থা পণ্যের দাম হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি নেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটার থেকে চলা ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন নিয়ে তৈরি হয় এক একটি ব্লক। সেগুলি যে 'নেট-খাতায়' (লেজার) লেখা থাকে, তাকে বলে ব্লক-চেন। এটির মাধ্যমে লেনদেনে নজরদারি চালায় সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ। হিসেব রাখার পদ্ধতিকে বলে 'মাইনিং'। যারা এই কাজ করেন, তাদের বলে 'মাইনার'।

● **ব্যাঙ্ক সংযুক্তি :**

গত ৪ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পয়লা এপ্রিলের মধ্যে ১০-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে চারটি ব্যাঙ্ক তৈরির পরিকল্পনায় হেরফের হয়নি। এব্যাপারে মন্ত্রিসভা সম্মতি দিয়েছে। এই ঘোষণার ফলে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মিশছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক মিশছে কানাড়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে। সংযুক্ত হচ্ছে অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জুড়ে তৈরি হচ্ছে একটি ব্যাঙ্ক। এর আগে স্টেট ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা এবং ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কের সংযুক্তি হয়। পয়লা এপ্রিলের পরে দেশে সাতটি বড়ো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থাকবে। তাছাড়া থাকবে পাঁচটি অপেক্ষাকৃত ছোটো ব্যাঙ্ক। ২০১৭ সালে মোট ২৭-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ছিল।

● **কার্ড ব্যবহারের নতুন ব্যবস্থা :**

ক্রমাগত বেড়ে চলা ডেবিট, ক্রেডিট কার্ডের এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে জানুয়ারিতে নতুন নিয়ম আনার কথা ঘোষণা করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বলেছিল, এই ব্যবস্থা আসবে ১৬ মার্চ থেকে। সেই মতো এদিন থেকেই চালু হয় এই কার্ড ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি। যেখানে গ্রাহক চাইলে কোথায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবেন, সেই সুবিধা চালু বা বন্ধের (সুইচ-অন সুইচ-অফ) সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন নিজেই। শীর্ষ ব্যাঙ্কের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৬ মার্চ থেকে নতুন কার্ড বা নতুন করে ইস্যু করা কার্ড দেওয়ার সময়ে সেগুলিতে শুধুমাত্র ভারতে এটিএম এবং পয়েন্ট অব সেলে (পিওএস) ব্যবহারের সুবিধা চালু থাকবে। কোনও গ্রাহক অনলাইনে (দেশে-বিদেশে), বিদেশে উপস্থিত থেকে এবং কনট্যাক্টলেস (না-ছুঁইয়ে) ব্যবস্থায় ওই কার্ড ব্যবহার করতে চাইলে আলাদা করে ব্যাঙ্কের কাছে সেজন্য আবেদন করতে হবে। চালু থাকা কার্ডগুলির ক্ষেত্রে ঝুঁকি বুঝে সেই সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা কার্ড ইস্যুকারী সংস্থা। তবে যেসমস্ত চালু কার্ড কোনও দিন নেট লেনদেন, বিদেশে বা কনট্যাক্সলেস ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়নি, সেগুলিতে নিজে থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে সেই সুবিধা বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

● **বিপিসিএল বিলগ্নিকরণের জন্য আগ্রহপত্র :**

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ খাতে আগামী অর্থবর্ষে ২.১ লক্ষ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্য স্থির করেছে কেন্দ্র। কার্যত সেই লক্ষ্যপূরণের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল গত ৭ মার্চই, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়ামকে (বিপিসিএল) দিয়ে। সংস্থাটিতে নিজেদের ৫২.৯৮ শতাংশ অংশীদারির পুরোটাই বেসরকারি হাতে তুলে দিতে প্রথম ধাপে এদিন আগ্রহপত্র চাইল লগ্নি ও সরকারি সম্পদ পরিচালন দপ্তর (দীপম)। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল শোধন সংস্থাটির কৌশলগত এই বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া দু'টি ধাপে হবে। প্রথমে, প্রস্তাবিত আগ্রহপত্র জমা দেবে ইচ্ছুক ক্রেতা। তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য সংস্থাগুলিকে বাছাই করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে সংস্থা কেনার জন্য তাদের থেকে আর্থিক দরপত্র চাওয়া হবে। সংস্থার নুমালিগড় শোধনাগারে কেন্দ্রের যে ৬১.৬৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে, তা অবশ্য বেসরকারিকরণ হচ্ছে না। ওই অংশীদারি সরকারি কোনও তেল ও গ্যাস সংস্থাকে বিক্রি করার কথা।

গত নভেম্বরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিপিসিএল-এ কেন্দ্রের পুরো অংশীদারি বিক্রি করার প্রস্তাবে সায় দেয়। সম্প্রতি এই বিক্রিতে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রের আন্তঃমন্ত্রিগোষ্ঠীও। পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পরে এটিই হবে এখনও পর্যন্ত দেশের মধ্যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বৃহত্তম বেসরকারিকরণ। প্রস্তাব অনুযায়ী, অংশীদারি বিক্রির পাশাপাশি বিপিসিএল পরিচালনার রাশও ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অংশ নিতে পারবে না। যেসব বেসরকারি সংস্থার নিট সম্পদ ১০০০ কোটি ডলার তারাই দরপত্র জমা দেওয়ার যোগ্য। জোট বেঁধে সংস্থাটি কেনার দৌড়ে নামতে পারবে সর্বাধিক ৪-টি সংস্থা। তবে জোটের প্রধান সংস্থাটির অংশীদারি হতে হবে ৪০ শতাংশ।

বাকি তিন পক্ষের নিট সম্পদ থাকতে হবে ন্যূনতম ১০০ কোটি ডলার। জোটের মধ্যে বদলের সময় মিলবে ৪৫ দিন। কিন্তু নেতৃত্বে থাকা সংস্থাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

● **ইএমআই-তে তিন মাসের স্বস্তি :**

করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় আমজনতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে স্বস্তি দিতে বড়োসড়ো ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)। মেয়াদি ঋণের উপর ইকুয়াল মান্থলি ইনস্টলমেন্ট বা ইএমআই পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তাতে ক্রেডিট স্কোরের উপরেও কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে উল্লেখযোগ্য, ইএমআই মকুব নয়, পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিলে তিন মাসের জন্য ইএমআই দিতে হবে না গ্রাহকদের। পরে কীভাবে সেই ইএমআই নেওয়া হবে, তা ব্যাঙ্কগুলি ঠিক করবে। কেউ পুরো ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ ঋণের মেয়াদ পাঁচ বছর হলে এক্ষেত্রে পাঁচ বছর তিন মাস হতে পারে। আবার এখনকার ইএমআই-এর সঙ্গে তিন মাসের ইএমআই বকেয়া ইএমআই-গুলির সঙ্গে সমান ভাগে যোগ হতে পারে।

আরবিআই-এর ঘোষণা অনুযায়ী সব ধরনের মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে। অর্থাৎ যেসব ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে শোধ করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেইসব ঋণের ইএমআই-এর আওতায় আসবে। এর মধ্যে পড়ছে বাড়ি, গাড়ি, শিক্ষার জন্য নেওয়া ঋণ। এমনকী পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তাছাড়া ফ্রিজ, টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের মতো ভোগ্যপণ্যের ঋণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। সুদ এবং আসল অর্থাৎ পুরো ইএমআই তিন মাসের জন্য দিতে হবে না। এবছরের পয়লা মার্চ থেকে যেসব ঋণের ইএমআই বাকি, সেগুলির ক্ষেত্রেই এই মকুবের ঘোষণা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ঘোষণা করলেই ছাড় পাওয়া যাবে। তবে এই সময়কালের জন্য সুদের অঙ্কটি অবশ্যই গুণতে হবে।

● **'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা' :**

দেশে নোভেল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে এবার ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বিশে, প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় এতদিন ৮০ কোটি মানুষ প্রতি মাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি চাল অথবা গম পেতেন। আগামী তিন মাস অতিরিক্ত আরও ৫ কেজি চাল অথবা গম দেওয়া হবে তাদের। দেওয়া হবে অতিরিক্ত ১ কেজি ডালও। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ এবং অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তারা জানা, যেসমস্ত সংস্থার কর্মীসংখ্যা ১০০-র কম এবং সংস্থার ৯০ শতাংশ কর্মীর বেতন ১৫ হাজারের কম, তাদের হয়ে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে ২৪ শতাংশ টাকাই জমা দেবে কেন্দ্র। অর্থাৎ নিয়োগকর্তা এবং কর্মী, দু'পক্ষের হয়েই কেন্দ্র টাকা দেবে।

এছাড়াও, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, ইপিএফ আইনে রদবদল ঘটাতেও সরকার প্রস্তুত বলেও জানান সীতারমণ। তেমনটা হলে, জরুরি পরিস্থিতিতে কেউ ছাইলে নিজের কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৭৫ শতাংশ অথবা তিন মাসের বেতন (যে অঙ্ক কম হবে), তা আগাম তুলতে পারবেন। এদিন অর্থমন্ত্রী জানান, করোনা পরিস্থিতিতে ইপিএফ আইনও সংশোধন করতে প্রস্তুত সরকার। এর ফলে কোনও কর্মী চাইলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৭৫ শতাংশ অথবা তিন মাসের বেতন (যে অঙ্ক কম হবে) তা আগাম তুলতে পারবেন। যেসমস্ত সংস্থার কর্মী-সংখ্যা ১০০-র কম এবং সংস্থার ৯০ শতাংশ কর্মীর বেতন ১৫ হাজারের কম, তাদের হয়ে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে ২৪ শতাংশ টাকাই জমা দেবে কেন্দ্র। অর্থাৎ নিয়োগকর্তা এবং কর্মী, দু'পক্ষের হয়েই কেন্দ্র টাকা দেবে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় আগামী তিন মাসের জন্য বিপিএল পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে।

জন ধন অ্যাকাউন্ট রয়েছে যে মহিলাদের, তাদের আগামী তিন মাসের জন্য ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এতে ২০ কোটি মহিলা উপকৃত হবেন। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি, বিধবা এবং প্রতিবন্ধীদের অতিরিক্ত ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে প্রতি মাসে। দু'দফার কিস্তিতে এই টাকা মিলবে। ১০০ দিনের কাজের আওতায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ২০২ টাকা করে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার আওতায় বছরে ৬ হাজার টাকা করে পান কৃষকরা। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই তা থেকে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ২ হাজার টাকা করে জমা পড়বে। প্রতি পরিবারপিছু বিনামূল্যে ১ কেজি করে ডালও দেওয়া হবে। দেশের ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষ এতে উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় কোনও গরিব মানুষকে উপোস করতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী অন্ন যোজনার আওতায় আগামী তিন মাসের জন্য বিনামূল্যে মাথাপিছু অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল অথবা গম দেওয়া হবে। আক্রান্তদের সেবায় নিযুক্ত ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য থাকছে আগামী তিন মাস মাথাপিছু ৫০ লক্ষ টাকার বিমা। আর দরিদ্র মানুষের জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ।

● **বিশ্ব মন্দার প্রথম ইঙ্গিত :**

করোনা ভাইরাসের জেরে বাড়ছে বিশ্ব মন্দার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার ইঙ্গিত এল প্রথম সারির মুক্ত অর্থনীতি সিঙ্গাপুর থেকে। গত ২৬ মার্চ প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে তাদের অর্থনীতি এক বছর আগের তুলনায় সরাসরি ২.২ শতাংশ কমতে চলেছে। সারা বছরে ১ শতাংশ-৪ শতাংশ কমতে পারে। মূল্যায়ন সংস্থা মুডি'জ এদিনই জানিয়েছে, ২০২০ সালে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি মন্দার মুখে পড়তে পারে। আমেরিকা এবং ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি যথাক্রমে কমতে পারে ২ শতাংশ এবং ২.২ শতাংশ। চিনের বৃদ্ধি কম হতে পারে ৩.৩ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) জানিয়েছে, বিস্ব অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে গেলে করোনার প্রভাব কেটে যাওয়ার পরে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বাড়াতে হবে। সমাধানসূত্র খুঁজতে হবে সমস্ত দেশ মিলে।

● **৬৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমলো :**

করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় গত ২৬ মার্চ ১.৭ লক্ষ কোটির আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তার পরের দিনই সাংবাদিক বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ঘোষণা করে রেপো রেট কমানোর। ৭৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানো হয় বলে জানান শক্তিকান্ত দাস। একইভাবে রিভার্স রেপো রেটও কমানো হয়েছে ৯০ বেসিস পয়েন্ট। এর ফলে এখন রিভার্স রেপো রেট হল ৪ শতাংশ। প্রতি দু' মাস অন্তর মানিটরি পলিসি কমিটি (এমপিসি) বৈঠকে বসে। পরবর্তী বৈঠক ছিল ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু সেই সময় এগিয়ে এনে এই বৈঠক করা হয়েছে ২৫ থেকে ২৭ মার্চ। এই বৈঠকেই রেপো রেট এবং রিভার্স রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

খেলা

➢ যোগ্যতা অর্জন পর্বের কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে টোকিও অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন ছয় বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি কম (৫১ কেজি)। তার পাশাপাশি, সেমিফাইনালে উঠে সেই ছাড়পত্র নিশ্চিত করে নিলেন আর এক ভারতীয় মহিলা বক্সার সিমরণজিৎ কৌর (৬০ কেজি) এবং পুরুষ বিভাগের অমিত পাঙ্ঘলও (৫২ কেজি)। জর্ডনের রাজধানী আম্মানে বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতায় গত ৮ মার্চ অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন ভারতের পাঁচ বক্সার। এরপর আবার মেরি, সিমরণজিৎ ও অমিত যোগ্যতা অর্জন করায় সেই সংখ্যা হল আট।

● **মাত্র ১৬ বছরে ইতিহাস শেফালির :**

মাত্র ১৬ বছর বয়স। আর এই বয়সেই আইসিসি-র টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ব্যাটসম্যান হলেন ভারতের মহিলা দলের ওপেনার শেফালি ভার্মা। ১৬ বছর বয়সে এদেশের কেউই আইসিসি-র তালিকায় এক নম্বর জায়গা দখল করতে পারেননি। গত ৪ মার্চ আইসিসি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। সেই ক্রমতালিকায় ১৯ ধাপ উঠে এসে ইতিহাস গড়লেন ভারতের মহিলা দলের ওপেনার। শেফালি এক নম্বর হওয়ায় নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস নেমে গেলেন দু'নম্বরে। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে এক নম্বর জায়গা দখল করে রেখেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস। শেফালি টপকে গেলেন তাকে। মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ যখন খেলতে এসেছিলেন শেফালি, তখন তার রেটিং পয়েন্ট ছিল ৭৪২। বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ থেকে শেফালি ১৬১ রান করেন। টি-২০ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৪৭ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৬ রানের মারমুখী ইনিংস খেলেন শেফালি। বিশ্বকাপে এ হেন পারফরম্যান্সের ফলে আরও ১৯ রেটিং পয়েন্ট পান তিনি। এর ফলে ৭৬১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভারতের ওপেনার। শেফালির আগে মিতালি রাজ টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর পজিশন পেয়েছিলেন। এবার শেফালি শীর্ষে পৌঁছলেন। ৭৫০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বেটস রয়েছেন দু'নম্বরে। তার থেকে চার পয়েন্ট কম পেয়ে বেথ মুনি রয়েছেন তিন নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন ৭৪২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থান পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং ৭০৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। অবশ্য ফাইনালের পরের দিনই শীর্ষ স্থান হারালেন ভারতের তারকা ওপেনার শেফালি ভার্মা। আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ব্যাটসম্যান হলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার বেথ মুনি। ১৬ বছরের ভারতীয় ওপেনার নেমে গেলেন তিন নম্বরে। টপ টেনে রয়েছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ও জেমাইমা রডরিগেজ।

● **টি-২০ বিশ্বকাপের সেরা দল ঘোষণা করল আইসিসি :**

আইসিসি-র ঘোষিত বিশ্বকাপের সেরা একাদশ। প্রথম এগারোয় জায়গা পেলেন মাত্র একজন ভারতীয়। চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার পাঁচজন রয়েছেন এই দলে। ওপেনিংয়ে অবশ্যই অ্যালিসা হিলি। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় ৩৯.৩৩ গড়ে করেছেন ২৩৬ রান। সঙ্গে রয়েছে সাত শিকার। ফাইনালে তিনি ৩৯ বলে করেন। অস্ট্রেলিয়া দলের মতো আইসিসি-র সেরা দলেও বেথ মুনিই থাকছেন ওপেনিংয়ে অ্যালিসার সঙ্গী হিসাবে। ৬৪.৭৫ গড়ে তিনি করেছেন ২৫৯ রান। ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে তিনি ৫৪ বলে অপরাজিত থাকেন ৭৮ রানে। তিন নম্বরে ইংল্যান্ডের ন্যাট স্কিভার। বিশ্বকাপে ৬৭.৩৩ গড়ে তিনি করেছেন ২০২ রান। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলার সুযোগ পেলে রান আরও বাড়ত তার। চারে ইংল্যান্ডেরই হিদার নাইট। ৬৪.৩৩ গড়ে তিনি করেছেন ১৯৩ রান। বৃষ্টির জন্য সেমিফাইনাল ভেস্তে যাওয়ায় তিনিও কম ম্যাচ পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মেগ ল্যানিং থাকছেন পাঁচে। ৪৪ গড়ে তিনি করেছেন ১৩২ রান। এই দলটার অধিনায়কও তিনি। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ককেই নেতৃত্বে বেছে নিয়েছে আইসিসি। লরা উলভার্ডট আএছন ছয় নম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার ১৪৯ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৯৪ রান।

এরপর রয়েছেন বোলররা। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি স্পিনার জেস জোনাসেন ১৪ গড়ে নিয়েছেন ১০ উইকেট। ফাইনালে ২০ রানে তিন উইকেট নিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টন আরও একজন বাঁহাতি স্পিনার। তিনি ৬.১২ গড়ে নিয়েছেন আট উইকেট। এরপর অ্যানা শ্রুবসেলে। ডানহাতি পেসার বিশ্বকাপে ১০.৬২ গড়ে নিয়েছেন আট উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার মেগান স্কুট দৌড়বেন নতুন বল হাতে। ১০.৩০ গড়ে ১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র ১৮ রানে চার উইকেট নেন তিনি। এগারো জনে ভারতের একমাত্র ক্রিকেটার হলেন পুনম যাদব। ১১.৯০ গড়ে বিশ্বকাপে ১০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফাইনালে ৩০ রানে এক উইকেট নেন তিনি। দ্বাদশ ব্যক্তিও অবশ্য একজন ভারতীয়। তিনি ১৬ বছর বয়সি শেফালি ভার্মা। ১৫৮.২৫ স্ট্রাইক রেটে বিশ্বকাপে ১৬৩ রান করেছেন তিনি। ফাইনালে অবশ্য ব্যর্থ হন। ফেরেন মাত্র দুই রানে।

● **রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল :**

তিরিশ বছর পরে বাংলা পারল না রঞ্জি জিততে। সেখানে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজকোটে গত ১৩ মার্চ ট্রফি তুলল পুজারাদের সৌরাষ্ট্র। প্রথম ইনিংসের রানে এগিয়ে থাকায়। ১৩ বছর পরে ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেয়েও স্বপ্নপূরণ হল না বাংলার। রানার্স তকমা নিয়েই ফিরলেন ঋদ্ধিমান সাহা, অনুষ্টুপ মজুমদার, মনোজ তিওয়ারিরা। ১৪ বার রঞ্জি ফাইনাল খেলে বাংলার জয় এসেছে মাত্র দুটোতে। তার মধ্যে একটা আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, সেই ১৯৩৯ সালে। অধিনায়ক ছিলেন টিসি লংফিল্ড। বার বার ফাইনালে হার যেন গায়ে সেঁটে দিয়েছে চোকার্স তকমা। রঞ্জি না জেতাকে প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা বাংলা অবশ্য টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তৃতীয় দল হিসাবে সবচেয়ে বেশিবার ফাইনাল খেলেছে।

১৯৩৯ সালের সেই ফাইনালে ওয়াজির আলির সাদার্ন পাঞ্জাবকে ১৭৮ রানে হারিয়ে দেয় টিসি লংফিল্ডের বাংলা। তারপর একের পর এক রঞ্জি এসেছে, গিয়েছে। কিন্তু জয় আসেনি বহু যুগ। দ্বিতীয় জয় আসতে অপেক্ষা করতে হয় ৫১ বছর। তৎকালীন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে সেই ম্যাচে অভিষেক ঘটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেই জয়ের মূল কাণ্ডারি ছিলেন বর্তমান বাংলা কোচ অরুণ লাল। তার অপরাজিত ৫২ রান বাংলাকে পৌঁছে দেয় জয়ের সারণিতে। সৌরভ করেছিলেন ২২ রান। অশোক মালহোত্রা, দীপ দাশগুপ্তর নেতৃত্বে দল ফাইনালে উঠলেও ট্রফি জিততে পারেনি। দীপের নেতৃত্বে পর পর দু'বার ফাইনালে ওঠে বাংলা। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির কাছে হারে সেই দল।

● **এক বছর পিছিয়ে গেল অলিম্পিক্স :**

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে পিছিয়ে যাওয়া টোকিও অলিম্পিক্সের নতুন সূচি ঘোষিত হল। কয়েক মাস আগেও কেউ ভাবতে পারেননি, এই বছরের ২৪ জুলাইয়ে দেখা যাবে না অলিম্পক্সের উদ্বোধন। কিন্তু মারণ ভাইরাসের থাবায় সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাই সত্যি করে তুলেছে। এর আগের সপ্তাহেই অলিম্পিক্স পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল; আর গত ৩০ মার্চ জানিয়ে দেওয়া হল টোকিও অলিম্পিক্সের নতুন তারিখ। নির্দিষ্ট তারিখ থেকে এক বছর পরে শুরু হবে টোকিও অলিম্পিক্স। ২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিক্স শুরু হবে ২৩ জুলাই এবং শেষ হবে ৮ আগস্ট। সব কিছু ঠিকঠাক চললে যে অলিম্পিক্স শেষ হ'ত এই বছরের ৯ আগস্ট। ২০২১ সালে হলেও অলিম্পিক্সের নাম থাকবে 'টোকিও ২০২০ অলিম্পিক্স'। এদিন বিশেষ বোর্ড মিটিংয়ের পরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পক কমিটি (আইওসি)। এই বছরের ২৫ আগস্ট থেকে যে প্যারালিম্পিক্স হওয়ার কথা ছিল, তা হবে ২৪ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অলিম্পিক্স বরাবরই নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে এসেছে। ১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল অলিম্পিক্স। এবারই প্রথমবার অলিম্পিক্স পিছিয়ে গেল।

● **ক্রিকেটের জাতীয় নির্বাচন কমিটির নয়া প্রধান :**

জাতীয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হল কর্ণাটকের প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার সুনীল জোশীকে। গত ৪ মার্চ ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি (সিএসি) নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছে। জোশী ছাড়া অন্য নির্বাচক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাক্তন পেসার হরবিন্দর সিং-কে। এম. এস. কে. প্রসাদের জায়গায় আসছেন জোশী। সিএসি-র তিন সদস্য, মদন লাল, আর. পি. সিং এবং সুলক্ষণা নায়েক পাঁচ ক্রিকেটারের 'ইন্টারভিউ' নেন। যার পরে দু'জনকে বেছে নেওয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চল থেকে যেমন জোশীকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তেমন মধ্যাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন হরবিন্দর। নির্বাচক কমিটির বাকি সদস্য হলেন, দেবাঙ্গ গান্ধী (পূর্বাঞ্চল), যতীন পরাঞ্জপে (পশ্চিমাঞ্চল) এবং শরনদীপ সিং (উত্তরাঞ্চল)। এদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বছরের সেপ্টেম্বরে। সিএসি এদিন যে পাঁচ জনের ইন্টারভিউ নেয়, তাদের মধ্যে জোশী আর হরবিন্দর ছাড়াও ছিলেন বেঙ্কটেশ প্রসাদ, লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন এবং রাজেশ চৌহান। জোশী ১৫-টি টেস্ট এবং ৬৯-টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন। হরবিন্দর খেলেছেন তিনটি টেস্ট এবং ১৬-টি ওয়ান ডে।

● **মোহনবাগানের আই লিগ, এটিকের আইএসএল :**

পাঁচ বছর পরে আই লিগ ঢুকল বাগানে। গত ১০ মার্চ কল্যাণীতে আইজলকে হারিয়ে ভারত সেরা হয়ে গেল সবুজ-মেরুণ শিবির। খেলার ৮০ মিনিটে পাপা দিওয়ারার শট আইজলের জাল কাঁপিয়ে দেয়। পাপাকে গোলের পাস বাড়িয়েছিলেন বেইতিয়া। সেই গোল আর শোধ করতে পারেনি আইজল। ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট পেয়ে এদিনই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল মোহনবাগান।

আই লিগ থেকে আইএসএল। মোহনবাগানের পরে এটিকে, ফুটবল ফের ভারত সেরা বাংলা। নেপথ্যে দুই স্পেনীয় চাণক্য। যথাক্রমে কিবু ভিকুনা ও আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। গত ১৪ মার্চ করোনা আতঙ্কে দর্শক শূন্য গোয়ার মারগাওয়ে ফতোরদা স্টেডিয়ামে চেন্নাইয়িন এফসি-কে হারিয়ে আইএসএল-এ চ্যাম্পিয়ন হল এটিকে। ম্যাচের ১০ মিনিটে প্রথম গোল করেন হাভিয়ার। দ্বিতীয় গোল তিনি করেন সংযুক্ত সময়ে। আইএসএল-এ এই মরশুমে গোল করতে না পারার যন্ত্রণা নিয়েই এদিন চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেতলে নেমেছিলেন তিনি। প্রথম গোল তিনি করেন রয় কৃষ্ণের পাস থেকে। তার দ্বিতীয় গোলের নেপথ্যে প্রণয় হালদার। এটিকে-এর আর এক গোলদাতা এদু গার্সিয়া। চেন্নাইয়িনের একমাত্র গোলদাতা নেরিউস ভালস্কিস।

প্রয়াণ

● **হংসরাজ ভরদ্বাজ :**

আইনজীবী হংসরাজ ভরদ্বাজ। ২০০৪ সালে মনমোহন সিং সরকারের আইনমন্ত্রী। পরে দুই রাজ্যে রাজ্যপালও হন, কর্ণাটক ও কেরালা। গত ৮ মার্চ জীবনাবসান হয় তার। বয়স হয়েছিল ৮২।

● **অমর চৌধুরী :**

রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী এবং আরএসপি নেতা অমর চৌধুরীর মৃত্যু হল গত ১৪ মার্চ। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ দিন বার্ধক্যজনিত সমস্যার ভুগছিলেন। এদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মারা যান। পরিবারের সম্মতিতে দেহ ওই হাসপাতালেই দান করা হয়। আরএসপি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণসভার রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি বিধায়ক হন। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্তমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

● **প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :**

পি. কে.। ১৬ বছর বয়সে সন্তোষ ট্রফি, ১৯ বছরে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। মাত্র ২০ বছর বয়সে অলিম্পিয়ান। কলকাতা, বাংলা-সহ ভারতীয় ফুটবল মহলে তিনি এ নামেই জনপ্রিয়। সবাই তাকে প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই চেনেন। তার নাম আসলে ছিল প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মী তার নাম নথিভুক্ত করার সময়ে ভুল লিখে ফেলেন। ৮৩ বছর বয়সে সেই প্রদীপ গত ২০ মার্চ নিভে গেল। ১৯৩৬-এর ২৩ জুন জলপাইগুড়িতে জন্ম। সন্তোষ ট্রফি প্রথম খেলেন বিহারের হয়ে। সেই প্রতিযোগিতা হয়েছিল কলকাতাতেই। প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ছিল আগমন। পাশের রাজ্যের প্রতিশ্রুতিমান হিসেবে। তারপর কলকাতাই হয়ে গেল পাকাপাকি ঠিকানা।

১৫ বছর আট মাস বয়সে সন্তোষ ট্রফিতে বিহারের হয়ে নজরকাড়া ফুটবল উপহার দিয়ে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৫৪ সালে কলকাতায় আগমন রাজস্থান ক্লাবে। পরের বছরেই ইস্টার্ন রেলে। ১৯৫৫-১৯৬৮, টানা ১৪ বছর ইস্টার্ন রেলের হয়ে কলকাতা লিগে ১১১ গোল। ১৯৫৮-তে লিগ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫৫ সালে ভারতের জার্সিতে ঢাকায় চার দেশীয় প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ। গোল করেছিলেন পাঁচটি। ১৯৫৬ সালে ভারতের হয়ে মেলবোর্ন অলিম্পিক্সে যাত্রা। ভারত চতুর্থ হয়। ১৯৬০ রোম অলিম্পিক্সে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। ১৯৬২ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা জয়। গোল ছিল চারটি। তিনটি এশিয়ান গেমস মিলিটে মোট ছ' গোল। বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি জয় ১৯৫৫ সালে। তিনবার রেলওয়েজের হয়ে (১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৬৬)। ইস্টবেঙ্গল (২৮) এবং মোহনবাগানের (২৫) কোচ হিসেবে মোট ৫৩-টি ট্রফি জিতেছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল (১৯৭২) এবং মোহনবাগানের (১৯৭৭) কোচ হিসেবে ত্রিমুকুট (শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স কাপ) জয়। ১৯৬১ সালে অর্জুন, ১৯৯০-এ অলিম্পিক 'ফেয়ার প্লে' ও পদ্মশ্রী,

২০০৪-এ ফিফার 'অর্ডার অব মেরিট' এবং ২০১২-য় মোহনবাগান রত্ন জেতেন।

● **আলব্যের ইউদেরজো :**

গত ২৪ মার্চ মারা গেলেন কালজয়ী কমিক সিরিজ অ্যাসটেরিক্সের চিত্রশিল্পী আলব্যের ইউদেরজো (পুরো নাম Alberto Aleandro Uderzo)। ফ্রান্সের নাগরিক ইউদেরজোর বয়স হয়েছিল ৯২। ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। অ্যাসটেরিক্সের জন্ম ১৯৫৯ সালে। কার্টুনের দুনিয়া তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মার্কিন সুপারহিরো আর বেলজিয়ামের সাংবাদিক তরুণটি। ফ্রান্সের এক পত্রিকার সম্পাদক চাইলেন বাচ্চাদের জন্য একেবারে নতুন একটা চরিত্র তৈরি করতে। ভার পড়ল চিত্রশিল্পী আলব্যের ইউদেরজো ও তার বন্ধু রেনে গোচিনির উপরে। শর্ত ছিল, চরিত্রটিকে হতে হবে একেবারে নতুন, ফ্রান্সের ঐতিহ্যবাহী। সেখান থেকেই ইউদেরজোর বারান্দায় এক পড়ন্ত বিকেলে জন্ম হল অ্যাসটেরিক্সের। ইউরোপের ইতিহাস ঘেঁটে দুই বন্ধু মিলে তৈরি করলেন গল যোদ্ধাদের জয়গাথা। লৌহযুগে ইউরোপের রোমান সভ্যতা ও রোমের গল জাতির যোদ্ধাদের গল্প নিয়ে অ্যাসটেরিক্সের পথচলা শুরু। রেনে গোচিনির তুখোড় ও সরস গল্প প্রাণ পেয়েছিল ইউদেরজোর ছবিতে। যুদ্ধবাজ অ্যাসটেরিক্স ও তার পরাক্রমী বন্ধু ওবেলিক্সকে নিয়ে লেখা সিরিজটি বিশ্ব জুড়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৭৭-এ মারা যান গসিনি। তবে অ্যাসটেরিক্স আর ওবেলিক্সের বীরগাথা থেমে যায়নি। ছবির পাশাপাশি এবার গল্পের জাল বোনাও শুরু করেন ইউদেরজো। এখনও পর্যন্ত কোটি কোটি কপি বিক্রি হয়েছে অ্যাসটেরিক্সের। অন্তত বারোটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে সিরিজটি। প্রচুর গল্প জীবন্ত হয়ে উঠেছে রুপোলি পর্দায় আর কার্টুনে। নতুন মালিকানায় গত অক্টোবরেও প্রকাশিত হয়েছে অ্যাসটেরিক্সের সাম্প্রতিকতম বইটি।

● **আব্দুল লতিফ :**

গত ২৩ মার্চ চলে গেলেন মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রাক্তন ফুটবলার আব্দুল লতিফ। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে মৃত্যু গুয়াহাটিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। ১৯৪৫ সালে হায়দরাবাদে জন্ম। উইংয়ের পাশাপাশি দলের স্বার্থে সিডফিল্ডার হিসেবেও খেলতেন তিনি। মহমেডান ভক্তদের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি দাপটের সঙ্গে খেলেছিলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। ক্লাব ফুটবলের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্বও করেন লতিফ। ১৯৭০ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন তিনি। তাছাড়া ১৯৬৮ সালে মায়ানমারে এশিয়া কাপ কোয়ালিফায়ার্স এবং ১৯৬৯ সালে মারডেকা কাপেও খেলেছিলেন। ফুটবল থেকে অবসরের পরে তিনি গুয়াহাটিতে চলে যান এবং কোচিং জীবন শুরু করেন। তার প্রশিক্ষণেই জুনিয়র এবং সার জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অসম। পরে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কোচিং (১৯৭৮-১৯৮০) করিয়েছিলেন।

● **মারিয়া টেরেসার :**

গত ২৭ মার্চ করোনার প্রকোপে এবার শোকের ছায়া নামল স্পেনের 'পারমা-বারবন' রাজপরিবারে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রাজকুমারী মারিয়া টেরেসার। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। নোভেল করোনার জেরে এই প্রথম কোনও রাজপরিবারের সদস্যের প্রাণ গেল। প্রিন্স হাভিয়ার এবং ম্যাডেলিন ডি. বারবানের ছয় সন্তানের অন্যতম মারিয়া টেরেসা ১৯৩৩ সালের ২৮ জুলাই প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সেই পড়াশোনা করেন তিনি। ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস এবং মাদ্রিদের কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনাও করেন। স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী হিসাবেই পরিবারে পরিচিত ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তার নিজের কোনও সন্তান নেই।

বিবিধ

● **বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের সূচনা :**

গত ১৭ মার্চ সূচনা হল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী। জন্মক্ষণের সঙ্গে মিল রেখে রাত ৮-টায় 'মুক্তির মহানায়ক' নামে অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ঢাকার নানা জায়গায় একযোগে শুরু হয় আতশবাজি প্রদর্শনী। করোনার সংক্রমণ রুখতে অনুষ্ঠান থেকে আড়ম্বর বাদ দিতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী নেতা শেখ মুজিবের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনায় ভিডিও বার্তায় বলেন, খুব ভালো লাগে, যখন দেখি বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রিয় দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর করার জন্য দিন-রাত কাজ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু মানে, একজন সাহসী নেতা, দৃঢ়চেতা মানুষ, একজন ঋষিতুল্য শান্তিদূত, ন্যায়, সাম্য ও মর্যাদার রক্ষাকর্তা এবং যেকোনও জোরজুলুমের বিরুদ্ধে ঢাল।

● **'ব্লু প্লাক' পাচ্ছেন নুর ইনায়েত খান :**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তার গুপ্তচরবৃত্তির কথা এখনও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই সাহসিনী নুর ইনায়েত খান এবার 'ব্লু প্লাক' পাচ্ছেন। গত ৫ মার্চ এই খবর ঘোষণা করেছে ইংলিশ হেরিটেজ। এই প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা এই সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন। ব্লুমসবেরির ৪ ট্যাভিটন স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন নুর ইনায়েত। সে বাড়ির বাইরেই বসবে 'ব্লু প্লাক'। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাড়ির বাইরে ইংলিশ হেরিটেজ এই বিশেষ প্রতীক বসায়। প্রতীকের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে তারা বুঝিয়ে দেয়, ওই বাড়িতে কোনও বিশেষ ব্যক্তি বাস করতেন। লন্ডনে 'ব্লু প্লাক' রয়েছে রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নামে। অক্সফোর্ডে নীরোদ সি চৌধুরীর বাড়ির বাইরেও রয়েছে 'ব্লু প্লাক'।

ভারতীয় বাবা এবং মার্কিন মায়ের সন্তান নুর ইনায়েত খান ১৯১৪ সালে মস্কোয় জন্মেছিলেন। বাবা হজরত ইনায়েত খান ছিলেন সুফি সন্ত। নুরের বড়ো হয়ে ওঠা লন্ডন এবং প্যারিসে। তাই ইংরেজি আর ফরাসি দু'টো ভাষাতেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে তার পরিবার লন্ডনে পালিয়ে আসে। এখানে 'উইমেনস অক্সিলিয়ারি এয়ার ফোর্স'-এ যোগ দেন নুর। রেডিও অপারেটর হিসাবে প্রশিক্ষণ নেন সেখানেই। এর পরে 'স্পেশাল অপারেশনস এগজিকিউটিভ' তাকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করে। সেই সময়ে তিনি প্রথম মহিলা রেডিও অপারেটর হয়ে ভুয়ো পার্সপোর্ট, একটি পিস্তল আর অল্প কিছু ফ্র্যাঙ্ক সম্বল করে নাৎসি-অধিকৃত প্যারিসে ঢুকে পড়েছিলেন। তিন মাস প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার পরে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে যান নুর। অসম্ভব নির্যাতন সহ্য করে, দীর্ঘদিন না খেতে পেলেও গোপন তথ্য ফাঁস করেননি কখনও। ১৯৪৪ সালে দাখাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হত্যা করা হয়েছিল তাকে। মরণোত্তর সম্মান, *জর্জ ক্রস* পেয়েছেন নুর।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

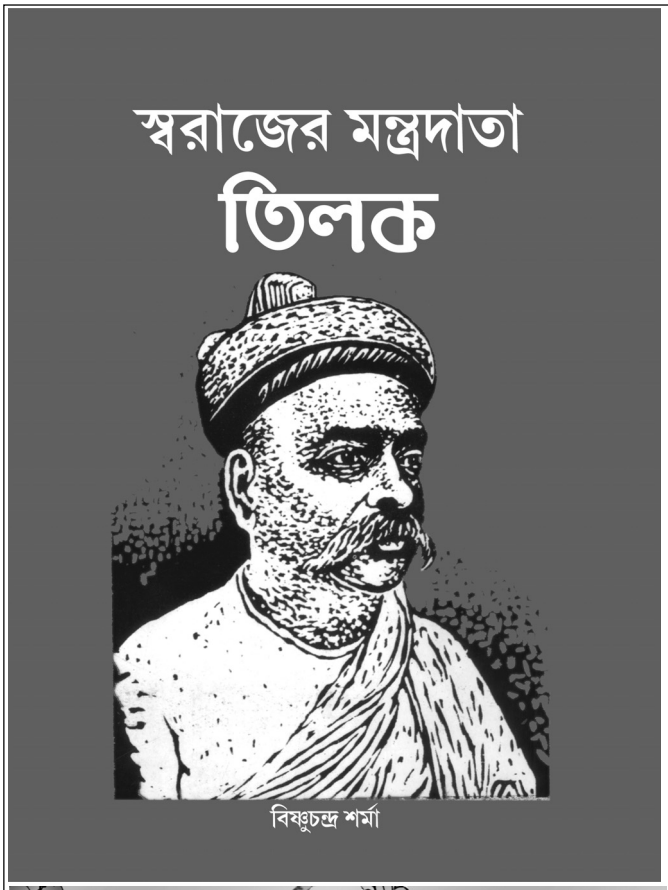
স্বরাজের মন্ত্রদাতা
তিলক
বিষ্ণুচন্দ্র শর্মা

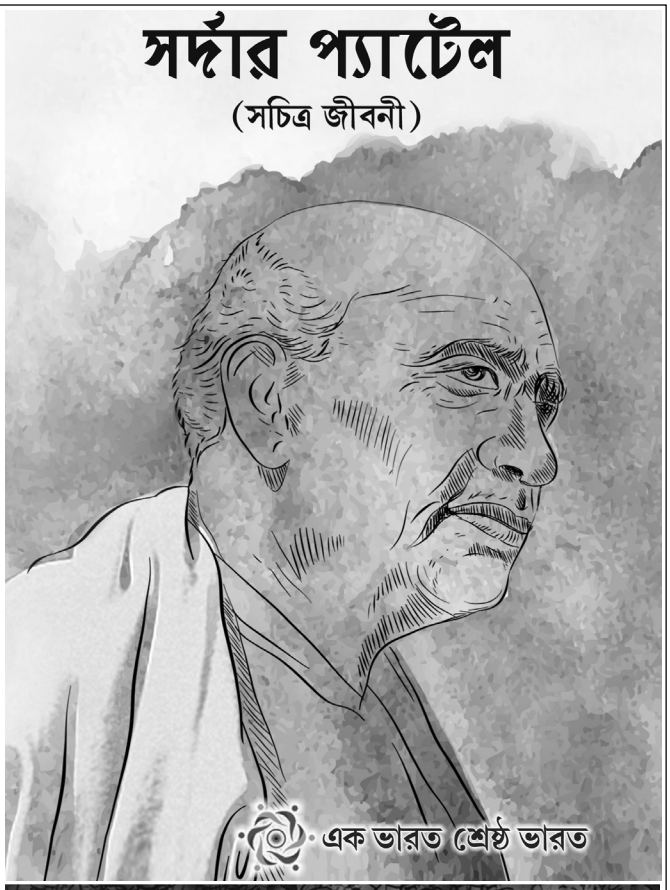
সর্দার প্যাটেল
(সচিত্র জীবনী)
এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত

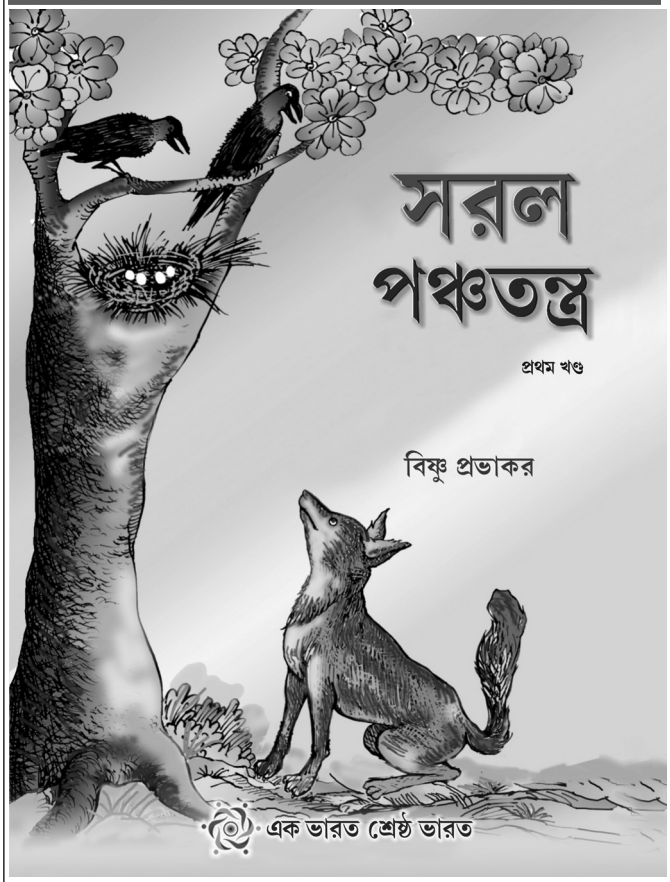
সরল
পঞ্চতন্ত্র
প্রথম খণ্ড
বিষ্ণু প্রভাকর
এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত

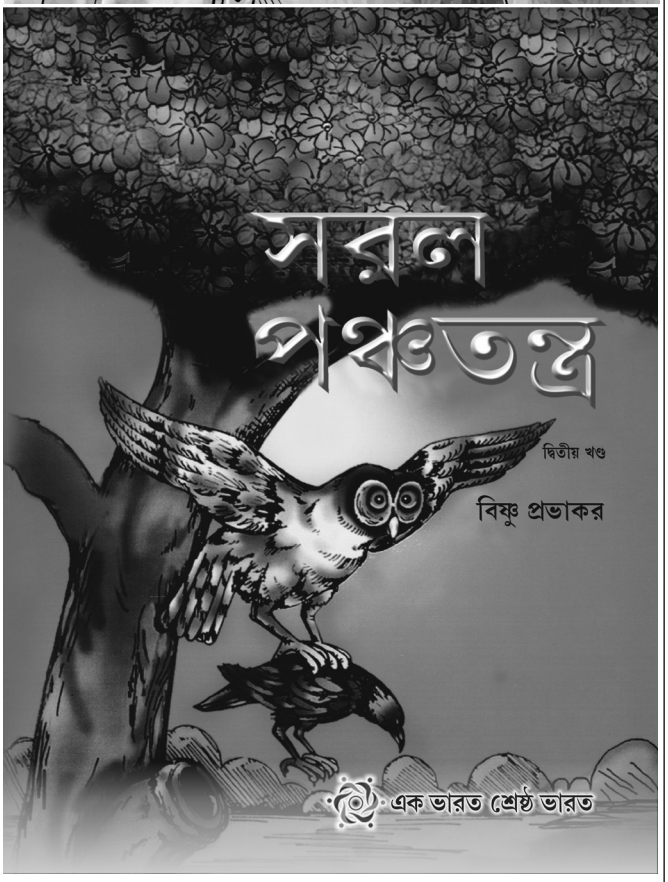
সরল
পঞ্চতন্ত্র
দ্বিতীয় খণ্ড
বিষ্ণু প্রভাকর
এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত

আমাদের প্রকাশনা

ভারতের সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি

"আমাদের দেশের সংবিধান আমাদেরকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে"।

"ভারতীয় সংবিধানের বিশেষত্ব হল তা দেশের নাগরিকদের অধিকার তথা তাদের কর্তব্য, উভয় দিকই বিশেষভাবে তুলে ধরে"।

"ভারতের গর্বিত নাগরিক হিসাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে নিজেদের কর্মকাণ্ডের দৌলতে কীভাবে আমরা জাতিকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলতে পারি"।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রকল্প ও নীতিসমূহ

সরকার গোটা দেশজুড়ে সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষের কল্যাণ ও উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। এর মধ্যে প্রভূত জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশেষত, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর এবং নিপীড়িত মানুষজনের উপর। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY), প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY), প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (PM KISAN), প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY), বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনা (BBBP) ইত্যাদি এমনই কিছু প্রকল্পের উদাহরণ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, মুসলমান, পার্সি এবং শিখ, এই ছয়টি কেন্দ্রীয় স্তরে প্রজ্ঞাপিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট করে কিছু কর্মসূচি/প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য :

- ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত মাপকাঠিতে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পূর্ব এবং মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে স্কলারশিপ প্রকল্প তথা মেধা ও দারিদ্র্যকে মাপকাঠি ধরে স্কলারশিপ প্রকল্প।
- মৌলানা আজাদ জাতীয় ফেলোশিপ প্রকল্প ফেলোশিপ কালীন আর্থিক সহায়তার বন্দোবস্ত।
- নয়া সবেরা বিনা পয়সায় কোচিং ও তৎসম্পর্কিত প্রকল্প। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী/পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনা পয়সায় কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা; যাতে করে তারা প্রযুক্তিগত/পেশাদার কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তথা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।
- পড়ো পরদেশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ঋণের সুদে ভরতুকি প্রদানের জন্য প্রকল্প।
- নয়ি উড়ান ইউপিএসসি, রাজ্য স্তরের পিএসসি, স্টাফ সিলেকশন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারি স্তরের গণ্ডি পেরোতে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- নয়ি রোশনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের নেতৃত্ব প্রদানের উপযোগী করে তোলা।
- শিখো আউর কামাও ১৪ থেকে ৩৫ বয়ঃসীমার যুবাদের জন্য দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প। স্কুল ছুট এবং বর্তমানে কর্মে নিযুক্তদের মধ্যে নিয়োগযোগ্যতা বাড়ানো এর উদ্দেশ্য।
- প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (PMJVK) : আগে MsDP নামে পরিচিত এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের মে মাসে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হিসাবে চিহ্নিত এলাকায় বসবাসকারী সব শ্রেণির মানুষের উপকারার্থে শিক্ষা, দক্ষতা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিসম্পদ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে।
- জিও পার্সি পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস ঠেকাতে প্রকল্প।
- উস্তাদ (USTTAD বা Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development) : ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা/হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের নিমিত্তে ২০১৫ সালের মে মাসে চালু করা হয়।

উল্লিখিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও, সরকার রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে ক্ষমতাশালী করতে এবং বাৎসরিক হজ্ব যাত্রার আয়োজনে সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে।

এইসব প্রকল্পের আওতায় স্থির করা লক্ষ্যমাত্রা এবং তার মধ্যে কতটা কী অর্জন করা গেছে সেসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সরকারের কয়েকটি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এগুলি হল, www.minorityaffairs.gov.in, www.maef.nic.in এবং www.nmdfc.org।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক দেশের চিহ্নিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে PMJVK নামক কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত একটি প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে। উদ্দেশ্য, উল্লিখিত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনের আর্থ-সামাজিক পরিসম্পদের বিকাশ ঘটানো এবং জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সুযোগসুবিধাদি দেশের বাকি অংশের সমপর্যায়ের করে তোলা। PMJVK খাতে ব্যয়িত অর্থের অন্তত ৮০ শতাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা বিকাশ ক্ষেত্রে এবং ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ মহিলাকেন্দ্রীক প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়।

PMJVK-র আওতায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় প্রয়োজন মাফিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের রূপরেখা প্রস্তুত করে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসকগণ মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেয় এমপাওয়ার্ড কমিটির বিবেচনার জন্য।❑

তথ্যসূত্র প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

April, 2020
R.N.I. No. 19740/69

OUR GANDHIAN LITERATURE

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক, ইরা যোশী কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।